দারসে কুরআন

৪

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে
কুরআন

৪র্থ খন্ড

অধ্যাপক আবদুল মতিন

www.icsbook.info

দারসে কুরআন-৪র্থ খন্ড
প্রকাশনায় ঃ সাহাল প্রকাশনী
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।

প্রকাশকাল ঃ
মে - ২০১১ সাল
বৈশাখ - ১৪১৮ সন
রবিউস সানি -১৪৩২ হিজরী

সত্ত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্টি কম্পিউটার,
৩০৮, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।
অক্ষর বিন্যাস ঃ মুহ্তারীমা তাবাসসুম
৩০, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।
মুদ্রণে ঃ ঈগল অফসেট প্রেস
৩০, খানজাহান আলী রোড,
শক্তিধাম মোড়,খুলনা।

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৬০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ সাহাল বুক কর্ণার
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩৮৯০৭৬ (লেখক)
ঃ ০১১৯১-৭৮২২৮৬ (দোকান)

প্রাপ্তিস্থান

কুরআন মহল, সিলেট।	কাটাবন বুক কর্ণার, ঢাকা।
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল।	ঢাকা বুক কর্ণার, পুরানাপল্টন, ঢাকা।
আল-হেলাল লাইব্রেরী, যশোর।	তাসনিয়া বই বিতান, মগবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সিলেট।	খন্দকার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা।	প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।
একাডেমী লাইব্রেরী, দেওয়ান বাজার,চট্টগ্রাম।	আহসান পাবলিকেশন, মগবাজার,ঢাকা।

এ ছাড়াও জেলা শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

www.icsbook.info

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব যা মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে সর্বশেষ নবী হয়রত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়।

মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে, পারিবারীক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যাবতীয় সমাধান আল-কুরআনে রয়েছে। এজন্য প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উচিত আল-কুরআনকে নিজের ভাষায় বুঝে তার শিক্ষানুযায়ী বাস্তব জীবনে আমল করা। কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের দেশের সামাজিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় আল-কুরআনের সঠিক শিক্ষাকে তুলে ধরার তেমন কোন বাস্তব মাধ্যম নেই। যতটুকু আছে তাও আবার সিলেবাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং ভিন্নভাবে কুরআনকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল-কুরআনের বিধি-বিধান মানতে হলে কুরআনের প্রকৃত বুঝ থাকা প্রয়োজন। আল-কুরআনের প্রকৃত বুঝ দেবার জন্যেই আমি আল কুরআনের বাছাই করা কতকগুলো অংশ থেকে 'দারসে কুরআন' খন্ড আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তারই অংশ হিসেবে চতুর্থ খন্ড প্রকাশ করা হলো এবং আগামীতে আরও খন্ড প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে- যদি আল্লাহ তাওফীক দান করেন।

আমি 'দারসে কুরআন' এর খন্ডগুলো ইসলামী আন্দোলনের আধুনিক ও সাধারন শিক্ষিত কর্মী ভাই-বোনদের দারস পেশ করার উপযোগী করে লিখার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া দারসে কুরআন প্রথম খন্ডের প্রথম দিকে কুরআনকে সহজে বুঝানোর জন্য ধারাবাহিক ভাবে দারস দানের পদ্ধতি ও দারসের সময় বন্টনের নমুনা হিসেবে চারটি ছক উল্লেখ করেছি এবং সাধারণ মানুষের উপর যাতে দারসের প্রভাব পড়ে সেই জন্য দারস দানকারীর কতিপয় করণীয় উল্লেখ করেছি। বইটি লিখার বিশেষ বৈশিষ্ট হলো শ্রোতার সামনে যেন আপনি নিজেই দারস পেশ করছেন।

দারসে কুরআন চতুর্থ খন্ড লিখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব গুণগ্রাহী ব্যক্তি ও পাঠক-পাঠীকা পরামর্শ, সময় ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের শুকরিয়া আদায় করছি এবং মহান আল্লাহর কাছে তাদের জন্য উৎতম প্রতিদান কামনা করছি।

লিখা ও ছাপার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। অতএব কোন সুহৃদয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে যদি ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে কিংবা কোন পরামর্শ থাকে, তাহলে আমাকে সরাসরি জানালে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো এবং ভবিষ্যতে সংশোধন করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে আমার আরজ, হে আল্লাহ! তোমার এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করতে যেয়ে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ত্রুটি কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য তুমি আমাকে মেহেরবানী করে ক্ষমা করে দিও। আর সীমিত জ্ঞানের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে আখিরাতে আদালতে নাজাতের জারিয়া বানিয়ে দিও। আমীন।

মুহাম্মদ আবদুল মতিন
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামীক ষ্টাডিজ বিভাগ
দৌলতপুর কলেজ (দিবা-নৈশ)
দৌলতপুর, খুলনা।

তারিখঃ ০১-০৫-২০১১

www.icsbook.info

উৎসর্গ

আল কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার
আন্দোলনে যাঁরা জীবন দান করেছেন
তাঁদের শাহাদাত কামনায়।

www.icsbook.info

৪র্থ খন্ডের সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্টা নং
০ জিহাদ-সংগ্রাম এবং ধৈর্যের পরীক্ষার মাধ্যমেই জান্নাত পাওয়া যাবে। (সূরা ঈমরান-১৪২-১৪৭)	০৬
০ জান্নাতের সুখ আর জাহান্নামের দুঃখ। (সূরা যুখরুফ-৬৭-৭৮)	২৬
০ চূড়ান্ত আন্দোলনের পরই আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসে। (সূরা নসর)	৪৩
০ ঝুঁকিপূর্ণ আন্দোলন থেকে এড়িয়ে থাকার বাহানা তালাশ না করা। (সূরা তাওবাহ-৩৮-৪১)	৫৯
০ অসার ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব, প্রাচুর্য গড়ার কাজে প্রতিযোগিতা না করা। (সূরা হাদীদ-২০-২৩)	৭৯
০ মানুষের কতিপয় নৈতিক দোষ ও ত্রুটি এবং তার পরিণতি। (সূরা হুমাজাহ)	৯৪
০ আল্লাহর বাছাইকৃত মুমিনদের প্রকৃত জিহাদ-আন্দোলন করা কর্তব্য। (সূরা হজ্জ-৭৮)	১০৫
০ শেষ রাতের নামায এবং কুরআন তিলাওয়াত তাকওয়ার জন্য খুব বেশী কার্যকর। (সূরা মুয্যাম্মিল-১-১৩)	১২৪

১ম খন্ডে যা আছে

০ দারসে কুরআন এর বক্তৃতা দান পদ্ধতি।

০ দারসের সময় বন্টন।

০ দারস দানকারীর করণীয়।

০ দারসের কতিপয় পরিভাষার সংজ্ঞা।

০ এক নজরে আল-কুরআনের পরিচয়।

০ মুত্তাকীনদের গুণাবলী। (সূরা বাকারা-১-৫)

০ মু'মিনদের গুণাবলী। (সূরা মু'মেনুন-১-১১)

০ বাড়ীতে ঢোকার শিষ্টাচার। (সূরা নূর-২৭-২৯)

০ ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে মানুষের বাঁচার উপায়। (সূরা আল আসর)

০ কঠিন আযাব থেকে বাঁচার উপায়। (সূরা সফ্ -১০-১৩)

০ মানবতার মুক্তির জন্য জিহাদ। (সূরা নিসা-৭৫-৭৬)

০ ঈমানের পরীক্ষা। (আলে ঈমরান-১৩৯-১৪১)

www.icsbook.info

০ সবরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা ও শাহীদের মর্যাদা।

(সূরা বাকারা-১৫৩-১৫৬)

০ মরণের আগেই আল্লাহর পথে অর্থ খরচ। (সূরা মুনাফিকুন-৯-১১)

০ কিয়ামতের দৃশ্য। (সূরা হজ্ব-১-২)

২য় খণ্ডে যা আছে

০ জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব। (সূরা আলাক-১-৫)

০ মুমিনের জিন্দেগী হবে তাকওয়া, আন্দোলন ও দাওয়াতী জিন্দেগী।

(সূরা আলে-ঈমরান-১০২-১০৪)

০ মুমিন জীবনের লক্ষ-উদ্দেশ্য ও তাদের বৈশিষ্ট্য

(সূরা তাওবা-১১১-১১২)

০ মুমিনদের ছয়টি বর্জনীয় আচরণ। (সূরা হুজুরাত-১১-১২)

০ দুনিয়াদারদের প্রতি সতর্কবাণী। (সূরা তাকাছুর-১-৮)

০ ইসলামী আন্দোলনঃ কর্মীদের গুণাবলী (সূরা মায়িদাহ-৫৪-৫৬)

০ আল্লাহর কতিপয় কুদরত ও নি'য়ামত। (সূরা আন নাবা-১-১৬)

০ মুনাফিকদের আচরণ। (সূরা বাকারা-৮-১৬)

৩য় খণ্ডে যা আছে

০ জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব। (সূরা তাওবাহ-১৯-২৪)

০ কতিপয় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ,
ওয়াদা এবং কসম রক্ষা করার গুরুত্ব। (সূরা নহল-৯০-৯৭)

০ অতীতের নবীদের দ্বীনের ন্যায় একই দ্বীনের
দাওয়াত দান এবং প্রতিষ্ঠার নির্দেশ। (সূরা শু'রা-১৩-১৬)

০ ঈমানের পরীক্ষা দিয়েই জান্নাতে যেতে হবে।(সূরা আনকাবুত-১-৭)

০ আল্লাহর উপর অবিচল ঈমান। সর্বোত্তম পন্থায়
দাওয়াত দান ওসহিষ্ণুতা প্রদর্শন।(হা-মীম-আস-সাজদাহ-৩০-৩৬)

০ দাওয়াতে দ্বীনের কাজে অধৈর্য হলে চলবে না।

(সূরা আনয়াম-৩৩-৩৬)

০ স্ত্রী-সন্তান এবং ধন-সম্পদ মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।

(সূরা তাগাবুন-১৪-১৮)

০ আখিরাতে অবিশ্বাসীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ। (সূরা মাউন)

www.icsbook.info

জিহাদ-সংগ্রাম এবং ধৈর্যের পরীক্ষার মাধ্যমেই জান্নাত পাওয়া যাবে।

সূরা-আলে ঈমরান ১৪২-১৪৭ আয়াত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ
فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا
مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ○ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ
قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ص فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○ وَمَا
مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَا۟ئِنْ
مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ
فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ○ وَمَا
كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ط وَمَنْ
يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ج وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ
نُؤْتِهٖ مِنْهَا ط وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ○ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ
مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ج فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ○
وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا
وَاِسْرَافَنَا فِيْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ ○

www.icsbook.info

অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১৪২) (মুমিনেরা!) তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ তা'য়ালা এখনও দেখেন নি যে, তোমাদের মধ্যে কারা কারা জিহাদ-সংগ্রাম করেছে এবং কারা কারা ধৈর্যশীল। (১৪৩) তোমরা তো (ইতোপূর্বে) মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখনতো তোমরা তা চোখের সামনেই উপস্থিত দেখতে পাচ্ছো। (১৪৪) আর মুহাম্মদ তো একজন রসূল ছাড়া কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও তো বহু রসূল বিদায় হয়ে গেছেন। তাহলে কি যদি তিনি মৃত্যু বরণ করেন অথবা নিহত (শহীদ) হন, তবে কি তোমরা (দ্বীন থেকে) ফিরে যাবে? বস্তুতঃ কেউ যদি (দ্বীন থেকে) ফিরে যায়, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিদান দান করেন। (১৪৫) (যেন রেখ,) আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কেউ মরতে পারে না-সেজন্য একটা সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে দুনিয়াতে বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দিয়ে দেব। অপরপক্ষে যে আখিরাতে বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা আখিরাতেই দেব এবং কৃতজ্ঞদেরকে আমি অবশ্যই প্রতিদান দেব। (১৪৬) (ইতোপূর্বে) আরও বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুসারী হয়ে জিহাদ-সংগ্রাম করেছে। আল্লাহর পথে (টিকে থাকতে) তাদের কিছু ঝুঁকি-কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর পথে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্ত-শ্রান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (১৪৭) তারা আর কিছুই বলেনি-শুধু বলেছে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার ! আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং (আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে) আমাদের কাজে যেসব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তাও মোচন করে দাও। আর (হে আল্লাহ! কাফিরদের মোকাবেলায়) আমাদেরকে দৃঢ় মজবুত রাখো এবং কাফিরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করো।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ أَمْ -কি। حَسِبْتُمْ -তোমরা হিসাব/ধারণা করেছো। أَنْ-যে। تَدْخُلُوا -তোমরা প্রবেশ করবে। الْجَنَّةَ -জান্নাতে। وَلَمَّا -অথচ না। يَعْلَمِ -জেনেছেন। الَّذِيْنَ -যারা। جٰهَدُوْا - জিহাদ/সংগ্রাম করেছো। مِنْكُمْ -তোমাদের মধ্যে। يَعْلَمَ -তিনি জানেন। الصّٰبِرِيْنَ - ধৈর্যশীলদেরকে। وَ -এবং। لَقَدْ -নিশ্চই/অবশ্যই। كُنْتُمْ -তোমরা। تَمَنَّوْنَ - কামনা করতেছিলে। الْمَوْتَ - মৃত্যুর। مِنْ قَبْلُ - ইতোপূবে।

تَلْقَوْهُ -তার সাক্ষাৎ পেতে। فَقَدْ -অতঃপর নিশ্চয়। رَاَيْتُمُوْهُ -তা তোমরা দেখছো। اَنْتُمْ -তোমরা। تَنْظُرُوْنَ - প্রত্যক্ষ করছো/দেখছো। مَا-নয়/কি। اِلاَّ -ছাড়া/ব্যতিরেকে। قَدْ - নিশ্চয়। خَلَتْ -অতীত হয়েছে। قَبْلِهِ -তার পূর্বে। اَفَائِنْ -তবে যদি কি। مَاتَ -তিনি মারা যান। اَوْ - বা/ অথবা/কিম্বা। قُتِلَ -নিহত হন। اِنْقَلَبْتُمْ -তোমরা ফিরে যাবে। عَلٰى -উপর। اَعْقَابِكُمْ -তোমাদের গোড়ালীর অর্থাৎ পিছন দিকে (অর্থাৎ কুফরীতে)। مَنْ -যে। يَنْقَلِبْ -ফিরে যাবে। عَقِبَيْهِ -তার দুই গোড়ালীর। فَلَنْ -তাহলে কক্ষণো না। يَضُرَّ -ক্ষতি করতে পারবে। شَيْئًا -কিছুই। سَيَجْزِى -প্রতিফল দেবেন। اَلشّٰكِرِيْنَ - কৃতজ্ঞদেরকে। مَنْ -যে। يُرِدْ -চায়। ثَوَابَ -নেকী। مِنْهَا -তা হতে। نُؤْتِهِ -আমরা তাকে দেব। سَنَجْزِى -আমরা শিগগীর প্রতিফল দেব। كَاَيِّنْ -কতো। قٰتَلَ -লড়াই করেছে। مَعَهُ -তাঁর সাথে। رِبِّيُّوْنَ - আল্লাহওয়ালা লোকেরা। كَثِيْرٌ - অনেক/ অধিক। فَمَا - অতঃপর না। وَهَنُوْا-তারা হতাশ হয়েছে। لِمَا -তার জন্য যা। اَصَابَهُمْ -তাদের উপর নিপতিত হয়েছে। فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-আল্লাহর পথে। وَمَا-এবং না। اسْتَكَانُوْا-তারা মাথা নতো করেছে। يُحِبُّ-ভালবাসেন। اَلصّٰبِرِيْنَ -ধৈর্যশীলদেরকে। كَانَ -ছিলো। قَوْلَهُمْ - তাদের কথা । اِلاَّ - এছাড়া। اَنْ -যে। قَالُوْا -তারা বলেছিলো। رَبَّنَا -হে আমাদের প্রতিপালক। اِغْفِرْ -মাফ করো। لَنَا -আমাদের জন্য। ذُنُوْبَنَا -আমাদের অপরাধসমূহ। اِسْرَافَنَا -আমাদের বাড়াবাড়িকে। اَمْرِنَا -আমাদের কাজের। ثَبِّتْ -দৃঢ় করো। اَقْدَامَنَا -আমাদের পদক্ষেপ। اُنْصُرْنَا - আমাদের সাহায্য করো। عَلٰى -উপর/বিরুদ্ধে। الْقَوْمِ -জাতি।

সম্বোধনঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইসলাম প্রিয়/প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা/ভাই ও বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে/খিদমতে দারস পেশ করার জন্য সূরা আলে ঈমরানের ১৪২ থেকে ১৪৭ নং পর্যন্ত মোট পাঁচটি আয়াত

তিলাওয়াত ও তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার ৩৩ নং আয়াতে উল্লেখিত- وَاٰلِ عِمْرٰنَ "ঈমরানের বংশধর" বাক্যটিকেই পরিচিতির জন্য চিহ্ন হিসেবে এই সূরার নামকরণ "আলে ঈমরান" করা হয়েছে। কেননা, আল কুরআনে ১১৪ টি সূরার অধিকাংশ সূরাই শিরোনাম হিসেবে নয় বরং প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবেই নামকরণ করা হয়েছে। আর এই নামকরণ আল্লাহর নবী (সঃ) নিজে করেননি বরং আল্লাহই করেছেন যা অহীর মাধ্যমে জানিয়া দেয়া হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ আলোচ্য সূরাটি সর্বসম্মত মতে মাদানী। তবে একই সময় সম্পূর্ণ সূরাটি অবতীর্ণ হয়নি। চারটি ভাষণে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে।

প্রথম ভাষণ ঃ প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু করে চতুর্থ রুকুর দ্বিতীয় আয়াত পর্যন্ত চলেছে। এই ভাষণটি সম্ভবত বদর যুদ্ধের সমসাময়িক সময় নাযিল হয়।

দ্বিতীয় ভাষণ ঃ এই ভাষণটি সূরার চতুর্থ রুকুর তৃতীয় আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে । নবম হিজরীতে আল্লাহর নবীর নিকট নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় এটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণ ঃ এই ভাষণটি সূরার সপ্তম থেকে শুরু করে দ্বাদশ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে । বিষয় অনুযায়ী প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই এটি নাযিল হয় বলে মনে হয়।

চতুর্থ ভাষণ ঃ এই ভাষণটি সূরার ত্রৈদশ রুকু থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। ওহুদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয় বলে মনে হয়।
(আল্লাহই বেশী ভাল জানেন)।

সূরাটির বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় ঃ এই সূরায় দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে । একটি দল হলো 'আহলি কিতাব' তথা ইহুদী ও নাসারা (খৃষ্টান) এবং অপর দলটি হলো স্বয়ং রাসূল (সাঃ) এর অনুসারী মুসলমান।সূরার প্রথমে 'আহলি কিতাব' তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে জোরাল ভাষায় তাদের

আকীদাগত বিভ্রান্তি এবং চারিত্রীক দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে রাসূল (সঃ) এবং আল কুরআনকে মেনে নেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

অপর পক্ষে দ্বিতীয় দল আর্থাৎ রাসূল (সঃ) এর অনুসারী মুসলমানদেরকে শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের মহান দায়-দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্যের পতাকা বহন এবং বিশ্ব মানবতার সংস্কার ও সংশোধনের জন্য পূর্ববর্তী উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রীক অধঃপতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে তাদের পদাঙ্কনুসরণ না করে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে তারা কিভাবে তাদের দায়-দায়িত্ব পালন করবে এবং যেসব আহলি কিতাব ও মুনাফিক নামধারী মুসলমানেরা আল্লাহর দ্বীনের পথে নানা প্রকারের বাধা সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি ধরণের আচরণ করতে হবে, তাদেরকে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমান দলটির মধ্যে যেসব দূর্বলতা দেখা দিয়েছিলো তার পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে বিরাজমান দূর্বলতাকে দূর করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ।

আলোচ্য আয়াতসমুহের মূল বক্তব্যঃ দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াত পাঁচটির মূল বক্তব্য হলো, আল্লাহ তা'য়ালা কেবল তাদেরকেই জান্নাত দিবেন যারা ধৈর্যের সাথে জিহাদ-সংগ্রাম করে টিকে থাকতে পারবে। আর আল্লাহ তা যাচাই করে নিবেন। অহেতুক আগে বেড়ে কোন যুদ্ধ-সংগ্রাম বা মৃত্যু কামনা না করা। বরং মৃত্যুর সময় আসলে তা হাসিমুখে বরণ করে নেয়া। দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের নেতা মুহাম্মদ (সঃ) এর মৃত্যু কিম্বা শাহাদাতের কারণে হতাশ হয়ে আন্দোলন থেকে পিছপা না হওয়া। কেননা, সকল নবী রাসূলই মানুষ, তাঁদের শাহাদাত কিম্বা মৃত্যু হবেই। দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করা আল্লাহর নির্দেশ সুতরাং তা পালনের জন্য অন্য এক যোগ্য ব্যক্তিকে নেতা বানিয়ে তার নেতৃত্বে জিহাদ-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। আর কাফির-খোদাদ্রোহী শক্তির উপর বিজয়ের জন্য দৃঢ় মজবুতভাবে টিকে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং নিজের কাজের ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।

www.icsbook.info

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের খিদমতে দারসের জন্য প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আলোচনা করা হলো। এখন তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি। দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন -

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

(হে মুমিনগন!) তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ্ এখনও যাচাই করে নেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা কারা জিহাদ-সংগ্রাম করেছে এবং কারা কারা ধৈর্যশীল।

আল্লাহ্ তা'য়ালা তার নি'য়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে কেবল প্রকৃত মুমিনদেরকেই প্রবেশ করাবেন। আর প্রকৃত মুমিন যাচাই-বাছায়ের মাধ্যমই হলো নিজের জান-মাল দিয়ে জিহাদ-সংগ্রাম করা। কেননা, একমাত্র জান-মাল কুরবানীর বিনিময়েই আল্লাহ্ জান্নাত দেবেন- অন্য কোন কিছুর বিনিময়ে নয়। এ মর্মে সূরা তাওবার ১১১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা যুদ্ধ-জিহাদ করে আল্লাহর পথে, অতঃপর তারা মারে এবং নিজেরাও মরে (শহীদ হয়ে যায়)।"

আয়াতের শেষাংসে আল্লাহ্ তা'য়ালা আরও বলেন যে, "তিনি দেখে নিতে চান কারা কারা ধৈর্যশীল"। আর্থাৎ কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও খোদাদ্রোহী শক্তির সকল ষড়যন্ত্র এবং সকল প্রকার বাধাকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করে কারা কারা দৃঢ় মজবুত থেকে যুদ্ধ-জিহাদ আন্দোলন-সংগ্রাম করে, এটাও আল্লাহ্ পরীক্ষা নীরীক্ষা করে নিবেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেন-

www.icsbook.info

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ۔

"আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না প্রমাণ হয় যে,কে কে তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও কে কে ধৈর্যশীল এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমুহ যাচাই করি।" (সূরা মুহাম্মদ-৩১)

যুগে যুগে এমন কি আমাদের বর্তমান সমাজেও দেখা যায়, অধিকাংশ মুসলমানই দ্বীনের অত্যন্ত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-এমনকি যা ইসলামের কোন অংশই নয় এমন সব সহজ, ঝুঁকিমুক্ত আ'মলের মাধ্যমে চোরা গোপ্তা পথে জান্নাতে যেতে চায়। দ্বীনের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝুঁকিযুক্ত আ'মল করতে চায় না । এ ধরণের আ'মলের ধারে কাছেও ঘেঁষতে চায় না। এ পথে অর্থ-সম্পদ খরচ করতে রাজি হয় না। দ্বীন কায়েমের আন্দোলনকে তথাকথিত প্রচলিত রাজনীতির সাথে জড়িয়ে দিয়ে জিহাদ-সংগ্রাম থেকে এড়িয়ে থাকতে চায়। অথচ আল্লাহর নবী (সঃ) জিহাদ থেকে দূরে অবস্থানকারীর মৃত্যু মুনাফিকদের মৃত্যুর সাথে তুলনা করে বলেন –

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ۔

"হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, অথচ সে (দ্বীনের জন্য) জীবনে যুদ্ধ জিহাদ করলো না, এমনকি অন্তরে একাজ করার চিন্তাও করলো না, তবে তার মৃত্যু মুনাফিকির অবস্থায় হলো।" (সহীহ মুসলিম)

অতএব জান্নাত পাবার এই ফর্মুলা অর্থাৎ জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ-সংগ্রাম করতেই হবে এবং কাফির, মুশরিক, মুনাফিক এবং খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে ধৈর্যের সাথে দৃঢ়-মজবুত ভাবে টিকে থেকে আন্দোলন করলেই কেবলমাত্র জান্নাত পাওয়া যাবে। বিকল্প কোন পথেই জান্নাত পাওয়া যাবে না। যারা বিকল্প পথে অর্থাৎ সহজ এবং ঝুঁকিমুক্ত পথে জান্নাত পেতে চায়, তাদের এ ধারণা ভুল। জান্নাত পাবার এসব পথ সঠিক নয়।

www.icsbook.info

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে বদর যুদ্ধে কাফিরদের শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আরো শক্তি নিয়ে পরবর্তী বছর কাফির-মুশরিকদের সশস্ত্র দল মদীনায় নবীর নবগঠিত ছোট রাষ্ট্র আক্রমনের জন্য ধেয়ে আসলে নবীজী (সঃ) তাঁর সঙ্গী-সাথী সাহাবাদের নিয়ে পরামর্শ করতে বসেন। পরামর্শে যেসব সাহাবাদের শাহাদাত লাভের অত্যধিক চাপে নবী করীম (সঃ) মদিনার বাইরে গিয়ে কাফিরদের মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেইসব শাহাদাতকামীদের উদ্দেশ্যে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন –

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ـ

আর তোমরা তো (ইতোপূর্বে) মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো (ওহুদ যুদ্ধে) তোমরা তা চোখের সামনেই উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ।

ওহুদ যুদ্ধের সাময়িক পরাজয়ের পর্যালোচনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর নবী (সঃ) তো চাচ্ছিলেন মদিনায় অবস্থান করেই কাফিরদের মোকাবেলা করতে। কিন্তু পরামর্শ সভায় তোমাদের অতি উৎসাহী শহাদাতের আকাংখী অধিকাংশের পরামর্শের ভিত্তিতেই মদিনার বাইরে গিয়ে কাফিরদের মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অথচ তোমরা এখন কাফিরদের চতুর্মুখী আক্রমনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর নবীকে রেখে জীবন রক্ষার জন্য পলায়নপর কেন? তোমরা তো এই মূহুর্তেরই কামনা করছিলে! নিজের জীবনকে বাজী রেখে হলেও কাফিরদের মোকাবেলা করে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতে চলে যাবে। এখন তোমরা প্রাণ রক্ষার জন্য পালাচ্ছো কেন? এখন তো তোমরা শাহাদাতের মৃত্যু তোমাদের চোখের সামনেই উপস্থিত দেখতে পাচ্ছো। এটাতো আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মহা পরীক্ষা। আর আল্লাহ তা'য়ালাও এ কঠিন বিপদের সম্মুখীন করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই জান্নাত দিতে চান। এ ধরনের পরীক্ষা আল্লাহ অতীতেও করেছেন। যেমন সূরা আনকাবুতের ২ ও ৩ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন–

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ـ

www.icsbook.info

"মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তারা ছাড়া পেয়ে যাবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছি যারা তাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ আবশ্যই জেনে নিবেন কারা কারা (তাদের কথায়) সত্যবাদী এবং কারা কারা মিথ্যাবাদী।"

এ আয়াতেও ঐ কথাই বলা হচ্ছে যে, যে পর্যন্ত ধৈর্যশীলদেরকে জানা না যায়। আর্থাৎ তারা দুনিয়ায় প্রকাশিত না হয়, সে পর্যন্ত তারা জান্নাত লাভ করতে পারবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তোমরা তো এই মূহুর্ত আসার পূর্বে এরূপ সুযোগেরই আকাংখা করছিলে যে, নিজের ধৈর্য ও দৃঢ়তা মহান আল্লাহকে দেখাবে এবং তার পথে শাহাদাত বরণ করবে। কাজেই এসো, আমি তোমাদেরকে সেই সুযোগ করে দিলাম, এখন তোমরা তোমাদের সেই ধৈর্য এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করো।

হাদীস শরীফে মহানবী (সঃ) বলেন - "তোমরা শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার আকাংখা করো না, আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করো এবং যখন যুদ্ধেক্ষেত্রে উপস্থিত হও তখন লৌহদন্ডের ন্যায় অটল ও অবিচল থাকো এবং জেনে রাখো যে, জান্নাত তরবাবীর ছায়ার নীচে।"

তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের সেই কামনার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখাচ্ছেন যে, তরবারী কচকচ-ঠনঠন শব্দ করছে, বর্শা তীব্র বেগে বের হচ্ছে, মূহর্মুহ তীর বর্ষিত হচ্ছে, ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে এবং এদিক-ওদিক মৃত্যুদেহ পড়তে রয়েছে।

বর্তমান সময়েও দেখা যায়, ইসলামী আন্দোলনের কিছু অতিউৎসাহী এবং অতি আবেগী নেতা কর্মীদের কারণে অনেক সময় নেতৃত্ব ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যখন জীবনের ঝুঁকি এসে হাজির হয়, মাল সম্পদের ক্ষতির সম্মুখীন হয়, পেশা এবং ব্যবসা বাণিজ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়, তখন আবার এরাই আগে ময়দান ত্যাগ করে। নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে যায়। ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকুরীর ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বিভিন্ন ওজর বাহানা তালাশ করে। জীবন দেয়ার সেই আবেগ এবং শাহাদাতের আকাংখার কথা বেমা'লুম ভুলে যায়। এ সমস্ত অতি আবেগী ও অতিউৎসাহী নেতা-কর্মীর কারণেই

একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াই। আন্দোলনকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়।

নবীজীর ইচ্ছার বাইরে পরামর্শকে গুরুত্ব দেয়ার কারণেই মদীনার বাইরে গিয়ে ওহুদ প্রান্তরে কাফিরদের চতুর্মুখী আক্রমণের ফলে নবীজীকে ফেলে রেখে নিজেদের জীবনকে রক্ষার জন্য পলায়নের দৃশ্য আমাদেরকে সেই শিক্ষায় দেয়।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে ওহুদ যুদ্ধে মহানবী (সঃ) এর শাহাদাতের সংবাদের পেক্ষিতে যুদ্ধে নিয়োজিত সাহাবাদের মনের অবস্থা এবং তাঁদের মন্তব্যের কারণে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এক মহা শিক্ষার কথা তুলে ধরে মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ-

মুহাম্মদ (সঃ) একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বে আরো অনেক রাসূলও বিগত হয়ে গেছেন। অতএব তিনি যদি মারা যান কিম্বা নিহত (শহীদ) হন, তাহলে তোমরা কি (দ্বীন থেকে) ফিরে যাবে? আর যে কেউ (দ্বীন থেকে) ফিরে যায়, তাতে সে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কারীদেরকে পুরস্কার প্রদান করবেন।

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট বা অবতরণের কারণ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসির (রহঃ) বলেন, ওহুদ প্রান্তরে মুসলমানেরা পরাজিত হয়েছিলো এবং তাঁদের কিছু সংখ্যক লোক শহীদও হয়েছিলো। সেদিন শয়তান এও প্রচার করে দিয়েছিলো যে, মুহাম্মদও (সঃ) শহীদ হয়ে গেছেন। আর এদিকে 'ইবনে কামিয়া' নামক একজন কাফির মুশরীকদের মধ্যে প্রচার করে 'আমি মুহাম্মদ (সঃ) কে হত্যা করে এসেছি'। প্রকৃতপক্ষে শয়তানের কথা ছিলো সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব এবং কাফির ব্যক্তির ঐ উক্তিও ছিলো মিথ্যা। সে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে আক্রমণ করেছিলো বটে তবে তাতে তাঁর চেহারা মুবারক কিছুটা আহত হয়েছিলো, তাছাড়া আর কিছুই হয়নি। এ মিথ্যা রটনায় মুসলমানদের মন ভেঙ্গে যায় , তাঁদের পা টলে যায় এবং তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালায়নে উদ্যৎ হন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

www.icsbook.info

এই আয়াত অবতীর্ণের আরও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, তা হলো- একজন মুহাজীর একজন আনসারীকে ওহুদের যুদ্ধের মাঠে দেখেন যে, তিনি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছেন এবং রক্তও মাটিতে প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি উক্ত আহত আনসারীকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে শহীদ হয়েছেন তা কি আপনি জানেন? তিনি উত্তরে বলেন, যদি এ সংবাদ সত্য হয় তবে তিনি তাঁর কাজ করে গেছেন। এখন আপনারা সবাই তাঁর দ্বীনের উপর নিজেদের জীবন কুরবান করুন। ঐ সম্বন্ধেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

নবী করীম (সঃ) এর শাহাদাতের সংবাদ ছড়িয়ে যাবার সাথে সাথে অধিকাংশ সাহাবী সাহস হারীয়ে ফেলেন, মনোবল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এবং পা টলটলায়মান হয়ে যায়। এ অবস্থার মধ্যে মুনাফিকরা বলতে থাকে, (উল্লেখ্য যে,ওহুদ যুদ্ধে আসার পথে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে ওবাই এর নেতৃত্বে প্রায় তিনশোত জন কেটে পড়ে, তার পরও কিছু কিছু মুনাফিক মুসলমানদের সাথে সাথেই ছিলো।) চলো আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে চলে যাই। সে আমাদের জন্য আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। আবার কেউ কেউ এমন কথাও বলে ফেলে, যদি মুহাম্মদ (সঃ) সত্যি সত্যিই আল্লাহর রাসূলই হতেন, তাহলে নিহত হলেন কেমন করে? চলো আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্মে ফিরে যায়। এসব কথার জবাবে আল্লাহ পাক বলেন, মুহাম্মদ (সঃ) এর শাহাদাত বা মৃত্যু এমন কিছু নয় যে, তোমরা আল্লাহ পাকের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে? তোমাদের প্রেম, ভালবাসা, আত্নত্যাগ যদি কেবল মুহাম্মদ (সঃ) এর ব্যক্তিত্বের সাথেই সম্পৃক্ত হয়ে থাকে যে, মুহাম্মদ (সঃ) এর দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সাথে সাথেই তোমরা আবার সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাবে, যা থেকে তোমরা বের হয়ে এসেছিলে, তাহলে আল্লাহর দ্বীন তোমাদের কোন প্রয়োজন অনুভব করে না। তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীন থেকে ফিরে চলে যাও তাহলে তোমাদের এ ফিরে যাওয়াতে আল্লাহর দ্বীনের কোনই ক্ষতি হবে না।

আয়াতের শেষাংসে মহান আল্লাহ বলেন – وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ

আর আল্লাহ তা'য়ালা তার কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রতিদান দান করেন।

www.icsbook.info

এখানে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তিনি ঐসব লোকদেরকেই উত্তম প্রতিদান দিবেন যারা কোন ব্যক্তি পূজা না করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তাঁর দ্বীনের কাজে লেগে থাকে ও তাঁর রাসূলের অনুসরণে সুদৃঢ় থাকে, তাতে রাসূল (সঃ) জীবিত থাক বা না থাক। আর প্রকৃতপক্ষে এরাই হলো আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহ।

ওহুদ যুদ্ধে মহানবী (সঃ) এর শাহাদাতের খবরে যেমন মুসলমানেরা ভেঙ্গে পড়েছিলো, অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো মহানবী (সঃ) এর ওফাতের সংবাদে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইন্তিকালের খবর পেয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘোড়ায় চড়ে আগমন করেন এবং মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে হযরত আয়িশা (রাঃ) এর ঘরে প্রবেশ করেন। এই ঘরেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে 'হিবরার' চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিলো। তিনি পবিত্র মুখমন্ডল হতে চাদর সরিয়ে চুমু দেন এবং কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমার পিতা মাতা তাঁর প্রতি কুরবান হোক। আল্লাহ তা'য়ালার কসম! তিনি রাসূল (সঃ) এর দু'বার মৃত্যু দিতে পারেন না। যে মৃত্যু তাঁর জন্যে নির্ধারিত ছিলো তা তাঁর উপর এসে গেছে। এরপর তিনি পুনরায় মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন যে, হযরত উমর (রাঃ) ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি তাঁকে বলেন যে, 'নীরবতা পালন করুন'। তাঁকে নিরব করে দিয়ে তিনি জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপাশনা করতো সে যেন জেনে নেয় যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত করতো, সে যেন সন্তুষ্ট থাকে যে, আল্লাহ পাক জীবিত আছেন। মৃত্যু তাঁর উপর পতিত হয় না।" অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি---وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ পাঠ করেন। তখন জনগণের মধ্যে এমনই অনুভূতি সৃষ্টি হলো যে, আয়াতটি যেন তখনই নাজিল হলো। সমস্বরে প্রত্যেকের মুখেই আয়াতটি উচ্চারিত হতে লাগলো এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলো যে, মুহাম্মদ (সঃ) আর এ জগতে নেই। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর মুখে এই আয়াতটি পাঠ শুনে হযরত ওমর (রাঃ) এর পা দু'টি যেন ভেজ্ঞে পড়লো। তাঁরও পূর্ণ বিশ্বাস হলো যে, প্রিয় নবী (সঃ) এ নশ্বর জগত থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।"

(সহীহ আল বুখারী)

www.icsbook.info

হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবদ্দশাতেই বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মৃত্যুবরণ করলে কিম্বা শহীদ হলে আমরা দ্বীন ত্যাগ করবো না। আল্লাহর শপথ! যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিহত হন তবুও আমরা তাঁর দ্বীনের উপর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবো। আল্লাহর কসম! আমি তো তাঁর বন্ধু ও চাচাত ভাই এবং তাঁর ওয়ারীশ। তাঁর আমার চেয়ে বড় হকদার আর কে হবে?

এ থেকে আমাদের জন্য শিক্ষনীয় হলো যে- যেভাবে রাসূল (সঃ) এর সঙ্গী-সাথীরা, যারা ছিলেন 'আশেকানে রাসূল' (রাসূল-প্রেমিক)। যারা রাসূল (সঃ) কে নিজের জীবনের চেয়েও ভাল বাসতেন, যাঁর থুথুকে মাটিতে পড়তে দিতেন না চেটে চেটে খেতেন, তাঁদের সেই প্রীয় নেতা এবং সর্দার যাঁর দাওয়াতে তাঁরা দ্বীনের মধ্যে সামিল হয়েছেন, সত্যের পথ পেয়েছেন, জাহান্নামের পথ ত্যাগ করে জান্নাতের পথে ধাবিত হয়েছেন, নিজের জীবনকে কুরবান করেছেন, নিজের ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বানিজ্য, স্ত্রী-সন্তান, আত্নীয়-স্বজন সব কিছুকেই ত্যাগ করে নবীর পথে টিকে ছিলেন, তাঁদের মাঝ থেকে নবীজীর বিদায় কতো যে ব্যাথার এবং মনোকষ্টের তা কেবল তাঁরাই অনুভব করতে পারেন যাঁরা তাঁর সাহচর্যে ছিলেন। তার পরেও আল্লাহ তা'য়ালা সাহাবাদেরকে কঠিন ভাবে শাসিয়ে বলছেন, যদি তোমরা মুহাম্মাদের মৃত্যুতে আমার দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে ব্যক্তি ভক্তির কারণে পুনরায় কুফরীর উপর ফিরে যাও, তাতে আল্লাহর দ্বীনের কোন ক্ষতি বা কমতি করতে পারবে না। বরং ক্ষতি যদি হয় তবে তাদেরই হবে যারা তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে।

সুতরাং যুগে যুগে যারাই ইসলামী আন্দোলন করবেন, আর সেই আন্দোলনের নেতা-তিনি যতই যোগ্য হোন না কেন, তিনি যতই প্রিয়ভাজন এবং শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র হোন না কেন, তাঁর মৃত্যুতে কিম্বা দুশমনদের আঘাতে শাহাদাতের কারণে অথবা যালিম বাদশাহ বা সরকারের দ্বারা শুল-ফাঁসির জন্যে কিম্বা শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পদস্খলনের কারণে তিনি যদি অনুপস্থিত হয়ে যান, তাহলে তাঁর অনুপস্থিতির কারণে আন্দোলন ত্যাগ করা যাবে না, কিম্বা দ্বীনী আন্দোলন থেকে মন ভাঙ্গা হয়ে দূরে সরেও থাকা যাবে না অথবা তাঁর পদস্খলনের কারণে তার সাথে সাথে দল থেকে বের হয়ে চলেও যাওয়া যাবে না।বরং

কোন কারণে নেতৃত্ব শূন্য হলে সেই স্থলে অন্য একজন যোগ্য ব্যক্তিকে নেতৃত্বে বসিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

হাদীস শরীফে এসেছে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যে সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দান করবেন তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হলো, ঐ দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহরই (সন্তুষ্টির) জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। আবার আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য তারা একত্রিত হয় এবং আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে আরও স্পষ্ট করে পরবর্তী আয়াতে বলেন- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا

আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কেউ মরতে পারে না। সেজন্য একটা সময় নির্দিষ্ট রয়েছে।

এ আয়াতে ওহুদ যুদ্ধ থেকে পলায়নপর মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর ভয়ে তোমাদের পালিয়ে যাবার কোন অর্থ হয় না। মৃত্যুর জন্য আল্লাহ যে সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার একমুহূর্ত আগেও কেউ মরতে পারে না আবার তার একমুহূর্ত পরেও কেউ মরতে পারে না। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়েই মৃত্যুবরণ করতে হবে। সুতরাং তোমাদের এতো ভয় কেন? যেমন আল্লাহ তা'য়ালা অন্য যায়গায় বলেছেন- "কারও বয়স বৃদ্ধি করা হয় না বা কারও বয়স কমও করা হয় না, বরং সবকিছুই আল্লাহর কিতাবে স্পষ্ট রয়েছে।"

অন্য আয়াতে আরও উল্লেখ রয়েছে - "তিনিই আল্লাহ! যিনি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা তৈরী করেছেন, অতঃপর তিনি সময় পূর্ণ করেছেন এবং মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন।"

উপরোক্ত আয়াতে কাপুরুষ লোকদেরকে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বীরত্ব প্রকাশের কারণে বয়সের যেমন কমতি হয় না, তেমনি কাপুরুষতা প্রদর্শন করে জিহাদ থেকে সরে পড়ার মাধ্যমে বয়স বৃদ্ধিও পায় না। মৃত্যুতো নির্ধারিত সময়ে আসবেই-তাতে মানুষ হয় বীরত্বের সাথে জিহাদ করুক বা ভীরুতা দেখিয়ে জিহাদ থেকে সরে থাকুক না কেন।

হযরত হাজার ইবনে উদ্দী (রাঃ) মুসলিম দুশমনদের মোকাবেলা করতে গিয়ে টাইগ্রীস নদীর সম্মুখীন হন। এমতাবস্থায় সেনাবাহিনী হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সে সময় তিনি উপরোক্ত আয়াতটি-

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا

পাঠ করে বলেন- "নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কেউই মারা যায় না। সুতরাং এসো, এই টাইগ্রীস নদীতেই ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো।" একথা বলেই তিনি টাইগ্রীস নদীর মধ্যে ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও নিজ নিজ ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ দৃশ্য দেখে ভয়ে শত্রুদের রক্ত শুকিয়ে যায় এবং তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। তারা পরস্পর বলাবলি করে, এরা তো পাগল। এরা সমুদ্রের তরঙ্গকেও ভয় করে না। কাজেই চলো আমরা পলায়ন করি। এই বলে তারা সবাই পালিয়ে যায়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

সুতরাং মুসলমানেরা তথা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা কোন সময়ের জন্যেই দুশমনদের রক্তচক্ষুকে ভয় করবে না, তাদের মামলা-হামলাকে পরোয়া করবে না। খোদাদ্রোহীদের চতুর্মুখী আক্রমনকে পরোয়া না করে মৃত্যু একবারই হয় এবং তা সময় মতই হয় একথা স্মরণ করে দৃঢ় পদে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করবে। আর এভাবে দৃঢ়চিত্তে মোকাবেলা করলেই পর দুশমনদের মন দুর্বল হয়ে যাবে, অন্তরে ভীতি সৃষ্টি হবে এবং মুজাহীদদের চলার পথ থেকে সরে দাঁড়াবে।

অতঃপর আল্লাহ পাক আয়াতের শেষাংশে বলেন –

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ج وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ط وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ٠

প্রকৃতপ্রক্ষে যে দুনিয়াতে প্রতিদান কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দিয়ে দেব। অপরপক্ষে যে আখিরাতে প্রতিদান কামনা করবে, আমি তাকে তা আখিরাতেই দেব। আর কৃতজ্ঞদেরকে আমি অবশ্যই প্রতিদান দান করবো।

আয়াতের এই অংশে আল্লাহ পাক বলেন, তোমরা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার চিন্তা না করে বরং তোমাদের হায়াতের যে সময়টুকু পাচ্ছো সেই সময়ে তোমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য দুনিয়া না আখিরাত কোনটি হবে সে বিষয়টিই চিন্তা ভাবনা করো।

তোমাদের কাজের বা কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু যদি দুনিয়ায় হয়, তাহলে তোমাদের দুনিয়াতেই প্রতিদান দিয়ে দেবো কিন্তু পরকালে একেবারে শুন্যহস্ত হয়ে যাবে। আর যদি পরকালের উদ্দেশ্য হয় তাহলে পরকালে তার প্রতিদানতো দেবই-বরং দুনিয়াতেও তার কিছু অংশ দান করবো। যেমন, অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে-"ইহকালে প্রতিদান কামনাকারীদের আমি তা প্রদান করি বটে, কিন্তু পরকালে তার জন্যে কোনই অংশ থাকে না"।

আর এক জায়গায় বর্ণিত আছে – "যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দুনিয়াই চায়, আমি তাদের মধ্যে যাকে চাই এবং যে পরিমান চাই দুনিয়াতে প্রদান করি, অতঃপর সে জাহান্নামী হয়ে যায় এবং লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে সেখানে সে প্রবেশ করে। আর যে পরকাল চায় এবং ঈমানদার হয় তাদের চেষ্টা আল্লাহর কাছে প্রশংসনীয় হবে।"

এজন্যেই এখানেও আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমি কৃতজ্ঞদেরকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকি। কৃতজ্ঞকারী বলতে এমন সব লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতের কদর করে। আর আল্লাহর এই বিশেষ নি'য়ামতটি হচ্ছে -"দ্বীনের সঠিক ও নির্ভুল শিক্ষা।" এ শিক্ষার মাধ্যমে তিনি মানুষকে এ দুনিয়ার সীমিত জীবনকাল থেকে অনেক বেশী ব্যাপক এবং সীমাহীন জগতের সন্ধান দিয়েছেন এবং তাকে এও সত্যটি জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টা সংগ্রাম-সাধনা ও কাজের ফলাফল কেবলমাত্র এ দুনিয়ার কয়েক বছরের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এ জীবনের পর আর একটি অনন্ত অসীম জীবন রয়েছে। যারা এসব জ্ঞান-দূরদৃষ্টিতা অর্জনের পর দেখে যে, তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফল দুনিয়ার জীবনে প্রাথমিক ভাবে ফলপ্রসু হচ্ছে না কিম্বা তার বিপরীত ফলাফল দেখে, তারপরেও আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তাদের কার্যক্রম এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। কেননা, আল্লাহ তাকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, আখিরাতে সে অবশ্যই এর উত্তম প্রতিদান পাবে - এসব শ্রেণীর লোকেরাই হচ্ছে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বা শুকরগুজারী বান্দাহ।(তাফহীমুল কুরআন)

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা ওহুদের যুদ্ধে নবীর শাহাদাতের খবরে হতাশ এবং হতোদ্দম মুজাহীদদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন –

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ -

(ইতোপূর্বে) আরও বহু নবী অতিবাহিত হয়ে গেছেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুসারী হয়ে জিহাদ-সংগ্রাম করেছে। আল্লাহর পথে (টিকে থাকতে) তাদের উপর যেসব বিপদ ও ঝুঁকি এসেছে এতে তারা মনমরা ও হতাশ হয়নি, দমে যায়নি এবং দুশমনের সামনে মাথা নতোও করে দেয়নি। এইসব ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ্ ভালো বাসেন।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীজীর সঙ্গী-সাথীদের সম্বোধন করে বলেছেন, ইতোপূর্বেও তো বহু নবী তাঁদের দলবল নিয়ে খোদাদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ-সংগ্রাম করেছিলেন এবং তোমাদের মতই তাদেরকেও বহু বিপদ-আপদ এবং বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, এমন কি এর চেয়েও অনেক অনেক বেশী। কিন্তু তারপরেও তো তাঁরা মনোভাঙ্গা হয়নি, দূর্বল হননি, খোদাদ্রোহীদের সামনে মাথা নতো করে দেননি বরং তাঁরা ধৈর্য এবং দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে কৃতজ্ঞ বান্দাহ্ হয়ে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় এর অর্থ এও করা হয়েছে যে, "হে ওহুদের যোদ্ধাগন! মুহাম্মদ (সঃ) শহীদ হয়েছেন, এই সংবাদ শুনে তোমরা সাহস-হিম্মতহারা হচ্ছো কেন? অথচ তোমাদের পূর্ববর্তী নবীর লোকেরা তাদের নবীগণের শাহাদাত প্রত্যক্ষ করেও তারা সাহস হারিয়ে ফেলেনি এবং তারা পিছপাও হয়নি, বরং তারা আরও ধৈর্য ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে। এতো বড় বিপদেও তাদের পা টলটলাইমান হয়নি এবং তারা দুঃখের ভারে ভেঙ্গেও পড়েনি। অতএব রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে তোমাদের এতো মুষড়ে পড়া মোটেই উচিত হয়নি।"

এ থেকে আমাদের জন্য শিক্ষনীয় হলো, ইসলামী আন্দোলনের নেতার মৃত্যু বা শাহাদাতের কারণে যেমন হতোদ্দম হয়ে মুষড়ে পড়া যাবে না, তেমনি আন্দোলনের ময়দান থেকে কেটে পড়াও যাবে না। বরং নেতার শাহাদাতকে শক্তির আঁধার বানিয়ে আরও মনোবল সংগ্রহ করে দৃঢ় কদমে মজবুত থেকে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করে

www.icsbook.info

ময়দানে টিকে থাকতে হবে। তাহলেই আল্লাহ্ দুনিয়াতে বিজয় দান করবেন এবং আখিরাতে মহা পুরুস্কার জান্নাত দান করবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ প্রিয়ভাজন মুজাহীদদের প্রার্থনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে পরবর্তী আয়াতে বলেন-

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ-

তারা এছাড়া আর কিছুই প্রার্থনা করেনি, তারা কেবল প্রার্থনা করেছে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং (আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে) আমাদের কাজে যে সব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তাও মোচন করে দাও। আর (হে আল্লাহ! কাফিরদের মোকাবেলায়) আমাদেরকে দৃঢ় মজবুত রাখো এবং কাফিরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করো।

যুগে যুগে সকল নবীর সংগী-সাথী মুজাহীদরা এমনই আল্লাহর প্রিয়ভাজন বান্দাহ্ ছিলেন যে, তারা তাদের আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে আল্লাহর কাছে দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিল বা ভোগ বিলাসের জন্য প্রার্থনা করেনি বরং তারা প্রার্থনা করেছে নিজের জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অপরাধ ক্ষমা করার। আর আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে মানুষ হিসেবে যেসব কাজ এবং পরিকল্পনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তা মোচন করার প্রার্থনা করেছে। আর তারা প্রার্থনা করেছে- কাফির, মুশরিক এবং খোদাদ্রোহী শক্তির মোকাবেলায় দৃঢ়-মজবুত থাকার এবং প্রার্থনা করেছে কাফিরদের সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলার জন্য সাহায্যের।

সুতরাং যুগে যুগে সকল ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের এছাড়া আর অন্য কিছুই কামনা বা প্রার্থনা করা বাঞ্ছনীয় নয়।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আলে ঈমরানের ১৪৩ থেকে ১৪৭ নং আয়াত সমূহের যেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হলো তা থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, তা হলো-

০ জান্নাত লাভের পথই হলো জিহাদ বা আন্দোলন-সংগ্রামের পথ। অন্য কোন চোরা গোপ্তা পথে জান্নাত লাভ করা যায় না। সাধারণতঃ মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মানুষই ঈমান এবং ধৈর্যের পরীক্ষা না দিয়েই সহজ

পথে জান্নাতে যেতে চায়। কিন্তু এটা ঈমান এবং ধৈর্য যাচাই এর পথ নয়। অথচ আল্লাহ্ যাচায় করে নিতে চান যে, কারা কারা জান মালের ঝুঁকি নিয়ে সংগ্রাম-আন্দোলন করে এবং সকল ঝুঁকি এবং বাধাকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করে অগ্রসর হতে পারে।

০ আগবেড়ে মৃত্যু কামনা করা ঠিক নয়। শত্রুর মোকাবেলা করার আকাংখাও প্রকাশ করা উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, যদি আল্লাহ্‌র দ্বীনের কাজ করতে যেয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হয় তাহলে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে হলেও তার মোকাবেলা করতে হবে। কেননা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা কুফরীর শামীল।

০ ইসলামী আন্দোলনের নেতার মৃত্যু কিম্বা শাহাদাতের কারণে অথবা যালিম শাসকের শুল-ফাঁসির কারণে আন্দোলন ত্যাগ করা যাবে না। কেননা, ইসলামী আন্দোলন করা হয় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য, কোন নেতার সন্তুষ্টির জন্য নয়। যেমন ওহুদ যুদ্ধে মুহাম্মদ (সঃ) এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে সাহাবারা হতাশ হয়ে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাদের শাসিয়ে বলেন, 'তোমরা কি নবীর মৃত্যু কিম্বা শাহাদাতের কারণে তোমরা তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরে কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করতে চাও'?

০ যদি কেউ ব্যক্তি পূঁজা এবং অতি ভক্তির কারণে নেতার অনুপস্থিতির সাথে সাথে দ্বীনী আন্দোলন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, এতে আল্লাহ্‌র বা তার দ্বীনের সামান্যতম ক্ষতি হবে না, বরং ক্ষতি হবে তার যে দ্বীন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিবে।

০ কৃতজ্ঞ বান্দাহ্ তারাই যারা আন্দোলন-সংগ্রামের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে। কোন্ নেতা থাকলো আর কোন্ নেতা থাকলো না তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায় দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা ধৈর্যের সাথে অব্যাহত রাখে। আল্লাহ্ এসব কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকেই দুনিয়া এবং আখিরাতে প্রতিদান দান করবেন।

০ প্রত্যেক মুমিনেরই এই বিশ্বাস থাকা উচিত যে, মানুষ তার নির্ধারিত সময়েই মৃত্যু বরণ করবে। এক মুহূর্ত আগে যেমন মরতে চাইলে মরতে পারবেনা, তেমনি এক মুহূর্ত পরেও মরতে চাইলেও মরার সুযোগ পাবেনা। নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। এজন্য মৃত্যুর ভয়ে দ্বীনি আন্দোলন থেকে পলায়ন না করে বরং জান-প্রাণ

দিয়ে সকল প্রকার ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে দ্বীনি আন্দোলনের কাজ অব্যাহত রাখা।

০ আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে দুনিয়ায় প্রতিদান কামনা না করা। কেননা, দুনিয়ায় প্রতিদান কামনা করলে দুনিয়া পাওয়া যাবে কিন্তু পরকালের জীবন শূন্য থাকবে। সুতরাং পরকালে প্রতিদান কামনা করা। এতে যেমন পরকালের সফলতা আসবে তেমনি আখিরাতের বিনিময়ের সাথে সাথে দুনিয়ার জীবনেও প্রতিদান হিসেবে দেয়া হবে আল্লাহর সাহায্য, বিজয়, সুখ শান্তি এবং সম্মান।

০ শুধু নবীর অনুসারীদেরকেই আল্লাহ্ জিহাদ দ্বারা পরীক্ষা করেননি বরং এর পূর্বে যতো নবী-রাসূল এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকের অনুসারীদেরকেই জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ পরীক্ষা করেছেন, তাদের এর চেয়েও বহু ঝুঁকি-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তারা হতাশ হয়নি, নিরাশ হয়নি বা মনোভাঙ্গা হয়নি, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়নি, দমেও যায়নি এবং কাফিরদের জন্য পথ পরিস্কার করে দেয়নি। অনুরূপভাবে আমাদেরকেও দ্বীনি আন্দোলন করতে যেয়ে বাতিল, খোদাদ্রোহী শক্তির অত্যাচার নির্যাতনে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া যাবে না, নিরাশ-হতাশ এবং মনোভাঙ্গা হওয়া যাবে না কিম্বা বাতিল শক্তির নিকট মাথা নওয়ানোও যাবে না। বরং ধৈর্য এবং সাহসের সাথে সবকিছুকে মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হবে। তাহলে অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য এসে হাযির হবে এবং আল্লাহ বিজয় দান করবেন।

০ মুমিন মুজাহিদদের আল্লাহর কাছে শুধু নিজের জীবনের অপরাধ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে মানুষ হিসেবে যেসব কাজে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রার্থনা করা। কাফির এবং খোদাদ্রোহী শক্তির মোকাবেলায় মজবুত কদমে টিকে থাকার জন্য দোয়া করা এবং কাফির এবং বাতিল শক্তির উপর বিজয়ের জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা।

আহ্বানঃ সম্মানিত ভাইয়েরা/বোনেরা! সূরা আলে ঈমরানের ১৪৩ থেকে ১৪৭ নম্বর আয়াত পাঁচটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং শিক্ষা আলোচনা করতে যেয়ে যদি আমার অজান্তে কোন ত্রুটি বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আয়াতগুলো থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে দারস শেষ করছি।

www.icsbook.info

দুই

জান্নাতের মহা সুখ আর জাহান্নামের মহা দুঃখ

সূরা যুখরুফ- ৬৭-৭৮ আয়াত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ
فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْاَخِلَّاۤءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ○ يٰعِبَادِ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ○ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ○ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ج وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ج وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْۤ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ○ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ○ وَمَاظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ○ وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ط قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ○ لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ○

অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে- (৬৭) বন্ধুরা! সেদিন (কিয়ামতের দিন) একে অপরের শত্রু হবে, তবে মুত্তাকীরা ছাড়া। (৬৮) হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আজ কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। (৬৯) তোমরা তো আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আত্মসমর্পণ করেছিলে। (৭০) তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ আনন্দের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করো। (৭১) (জান্নাতে) তাদের নিকট পরিবেশন

www.icsbook.info

করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং সেখানে রয়েছে মনে যা চায় ও চোখ যাতে জুড়ায়। আর তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে। (৭২) এই যে জান্নাতের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) তোমরা হয়েছো, এটা তোমাদের কাজের প্রতিদান। (৭৩) যেখানে রয়েছে তোমাদের জন্য প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। (৭৪) (পক্ষান্তরে) অবশ্যই অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। (৭৫) তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে হতাশ হয়ে। (৭৬) আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি; কিন্তু তারাই ছিলো যালিম। (৭৭) তারা (জাহান্নাম থেকে) ডেকে বলবে, হে (জাহান্নামের অধিকর্তা) মালেক, তোমার পালনকর্তা আমাদেরকে একেবারেই নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে, অবশ্যই তোমরা চিরকাল এভাবেই থাকবে। (৭৮) আমি তোমাদের কাছে সত্যদ্বীন পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলো সত্যদ্বীন থেকে বিমুখ।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اَلْاَخِلَّاۤءُ -বন্ধুবর্গ। يَوْمَئِذٍ -সেদিন। بَعْضُهُمْ - তাদের একে। لِبَعْضٍ -অপরের জন্য। عَدُوٌّ - শত্রু। اِلَّا -ছাড়া/ব্যতীত। اَلْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীরা। يٰعِبَادِ -হে আমার বান্দারা। لَاخَوْفٌ -কোন ভয় নেই। عَلَيْكُمْ -তোমাদের উপর। اَلْيَوْمَ -আজ। لَا -না। اَنْتُمْ - তোমরা। تَحْزَنُوْنَ -চিন্তা করবে। اَلَّذِيْنَ - যারা। اٰمَنُوْا - ঈমান এনেছিলো। بِاٰيٰتِنَا -আমাদের আয়াত সমূহের উপর। وَكَانُوْا - এবং তারা ছিলো। مُسْلِمِيْنَ-আত্মসমর্পনকারী (মুসলমান)। اُدْخُلُوْا - প্রবেশ করো। اَنْتُمْ - তোমরা। وَ -ও/এবং। اَزْوَاجُكُمْ -তোমাদের স্ত্রীরা। تُحْبَرُوْنَ - তোমাদেরকে খুশী করে দেয়া হবে। يُطَافُ - আবর্তিত করা হবে। عَلَيْهِمْ - তাদের উপর/কাছে। بِصِحَافٍ - থালাসমূহ। مِّنْ - নির্মিত। ذَهَبٍ -স্বর্ণের। اَكْوَابٍ-পানপাত্রসমূহ। فِيْهَا -তার মধ্যে/উহাতে। مَا - যা কিছু। تَشْتَهِيْهِ -তা চাইবে। الْاَنْفُسُ -অন্তর সমূহ। تَلَذُّ -তৃপ্ত হবে। اَلْاَعْيُنُ-চোখ সমূহ। خٰلِدُوْنَ -চিরস্থায়ী হবে। تِلْكَ -এই যে। اَلَّتِىْٓ - যার। اُوْرِثْتُمُوْهَا -তোমরা উহার উত্তরাধিকার হয়েছো। بِمَا -যার সাথে। كُنْتُمْ -তোমরা ছিলে। تَعْمَلُوْنَ -তোমরা কাজ করেছো। لَكُمْ - তোমাদের জন্য। فِيْهَا -উহাতে। فَاكِهَةٌ - ফলমূল। كَثِيْرَةٌ - অধিকাংশ।

مِنْهَا-উহাতে। تَأْكُلُوْنَ -তোমরা ভক্ষণ করবে। اِنَّ -নিশ্চয়। اَلْمُجْرِمِيْنَ -অপরাধিরা। فِىْ -মধ্যে। عَذَابِ -শাস্তি। لَايُفَتَّرُ -লাঘব করা হবে না। عَنْهُمْ -তাদের থেকে। وَهُمْ -এবং তারা। فِيْهِ -উহাতে। مُبْلِسُوْنَ -হতাশ হয়ে। مَاظَلَمْنٰهُمْ -আমি তাদের উপর যুলুম করিনি। لٰكِنْ -বরং। كَانُوْا -তারাই ছিলো। نَادَوْا -আহ্বান/ডাকবে। يٰمٰلِكُ -হে (জাহান্নামের) অধিকর্তা। لِيَقْضِ -একেবারেই নিঃশেষ করে দিন। عَلَيْنَا -আমাদেরকে। رَبُّكَ -তোমার প্রতিপালক। قَالَ -বলবেন। اِنَّكُمْ -নিশ্চয় তোমরা। مّٰكِثُوْنَ -(এভাবে) চিরকাল থাকবে। لَقَدْ -নিশ্চয়/অবশ্যই। جِئْنٰكُمْ -তোমাদের কাছে আমরা এসেছিলাম। بِالْحَقِّ -সত্যসহকারে। لٰكِنَّ -কিন্তু। اَكْثَرَكُمْ-তোমাদের অধিকাংশ। لِلْحَقِّ-সত্যের প্রতি/জন্য। كٰرِهُوْنَ -বিমুখ/অসহনশীল।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় দ্বীনদার ভায়েরা/বোনেরা/ভাই ও বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য "সূরা যুখরুফ" এর ৬৯ থেকে ৭৮ নম্বর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাকে সঠিক ভাবে আপনাদের সামনে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরায় ৩৫ নং আয়াতে উল্লেখিত " وَزُخْرُفًا " শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'যুখরুফ' অর্থ- 'স্বর্ণ নির্মিত'। উল্লেখ্য যে অন্যান্য সূরার ন্যায় এই সূরার নামকরণও করা হয়েছে প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে। কোন শিরোনাম হিসেবে নামকরণ করা হয়নি।

নাযিল হবার সময়কাল ঃ সর্বসম্মতভাবে সূরাটি মাক্কী। তবে কোন্ অবস্থায় নাযিল হয়েছে তা কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা বা ঘটনা থেকে জানা যায় না। কিন্তু এই সূরার বিষয়বস্তু থেকে চিন্তা-গবেষণা করলে স্পষ্ট মনে হয় যে, এই সূরাও সেই সময় নাযিল হয় যখন সূরা আল মু'মিন, সূরা হা-মীম আস্ সাজদাহ ও সূরা আস্ শুরা নাযিল হয়। এই সূরা কয়টি একই ধারাবাহিকতার বলে মনে হয়। আর মক্কার কাফিররা যখন নবী

করীম (সঃ) কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো। দিন-রাত বৈঠক-সভা করে এই বিষয়ে শলা-পরামর্শ করতেছিলো তাঁকে এবং তাঁর আন্দোলনকে কিভাবে শেষ করা যায়। সেই সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করছিলো। এই সময় তাঁর উপর একটা মরণ আঘাতও পড়েছিলো। ঠিক এরূপ পরিস্থিতিতেই উল্লেখিত সূরাসমূহ নাযিল হয়েছিলো। উল্লেখিত এই সূরার ৭৯ ও ৮০ নং আয়াত দু'টি এই দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সূরার আলোচ্য বিষয় বা মূল বিষয়বস্তু ঃ এই সূরায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে কুরাইশ ও আরববাসীদের জাহেলী আকীদা-বিশ্বাস, রেশম-রেওয়াজ ও কুসংস্কারের সমালোচনা করা হয়েছে। এসব আকিদা-বিশ্বাস এবং কুসংস্কারমূলক ধারণা-বিশ্বাসের উপর তারা এমন অটল ছিলো যে, তারা তা ত্যাগ করতে কিছুতেই প্রস্তুত হচ্ছিলো না। এই সূরায় তাদের এসব আকীদা-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অসারতা অত্যন্ত দৃঢ় ও মর্মস্পর্শী পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যার মধ্যে একবিন্দুও জ্ঞান রয়েছে সে যেন চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, জাতি আজ অত্যন্ত নীচ ধরণের মূর্খতায় ডুবে আছে। আর যে ব্যক্তি এসব মূর্খতা এবং অজ্ঞতার ফাঁদ থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করছে, তাঁকে ধ্বংস করতে সকলে মিলে আদা-জল খেয়ে লেগে গিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু ঃ দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর মূল বিষয়বস্তু হলো- কিয়ামতের দিন মুত্তাকী বন্ধু ছাড়া আর কেউ কাজে আসবে না। বরং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিয়ামতের দিন ঈমানদার এবং অনুগত বান্দাদের জন্য জান্নাতের নি'য়ামতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা পাপী অপরাধী তাদের পরিণতি এবং জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। জাহান্নামীদের আর্তনাদের বিভৎস বর্ণনাও দেয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা বুঝানোর সুবিধার্থে আপনাদের সামনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতিপয় বিষয় তুলে ধরা হলো। এখন আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি।

কিয়ামতের দিন দুনিয়ার বন্ধুদের অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান

আল্লাহ বলেন – اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ

বন্ধু-বান্ধব সেদিন (কিয়ামতের দিন) একে অপরের শত্রু হবে, তবে মুত্তাকীরা ছাড়া।

এই আয়াতে দুনিয়ার বন্ধুত্ব ও দোস্তালী যাদের নিয়ে মানুষ গর্ববোধ করে, হালাল-হারামের বাছ-বিচার করে না, এমন কি কোন কোন বন্ধুর জন্য জান-মাল পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, কিয়ামতের দিন এসব প্রিয়ভাজন বন্ধুই শত্রুতে পরিণত হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন যখন মানুষ কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে, তখন দুনিয়ার এতো প্রিয় বন্ধুত্ব আরও বিপদের কারণ হবে,তবে উপকারী এবং প্রকৃত বন্ধু হয়ে দাঁড়াবে একমাত্র তারাই যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করে চলতো। যাদের সাথে বন্ধুত্ব করার পেছনে কোন দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার করার উদ্দেশ্য ছিলো না বরং আল্লাহর সন্তুষ্টিই যাদের উদ্দেশ্য ছিলো, তারাই কেবলমাত্র কঠিন বিপদের সময় মুক্তির কান্ডারী হবে। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন –

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ـ

"আর তিনি বললেন, (হে আমার জাতির লোকেরা!) তোমরা আল্লাহ ছাড়া প্রতিমাগুলোর সাথে যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রেখেছো তা শুধু দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরের উপর অভিশাপ দিবে এবং তোমাদের ঠাঁই হবে জাহান্নামে। আর তোমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না।" (সূরা আনকাবুত-২৫)

আয়াতের তাফসীরে আল্লামা হাফেজ ইবনে কাসীর হযরত আলী (রাঃ) এর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন, দুই মু'মিন বন্ধু ছিলো এবং দুই কাফির বন্ধু। মুমিন বন্ধু দু'জনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হলো। তখন তার আজীবন বন্ধুর কথা মনে পড়লে সে দোয়া করলো- হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো। সে তোমার ও তোমার রাসূলের অনুগত্য করার আদেশ দিতো।

আমাকে সে সৎ ও নেক কাজের উপদেশ দিতো এবং অসৎ ও পাপ কাজ হতে বারণ করতো এবং তোমার সাথে সাক্ষাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতো। কাজেই হে আল্লাহ! আমার পরে তুমি তাকে পথভ্রষ্ট করবে না, যাতে সেও আমার মতো জান্নাতের দৃশ্য দেখতে পায়। তার উপর তুমি সেরূপই সন্তুষ্ট হয়ে যাও-যেরূপ সন্তুষ্ট আমার প্রতি তুমি হয়েছো। তার এই দোয়ার কারণে আল্লাহ তাকে জবাবে বলবে, তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে (জান্নাতে) চলে যাও। আমি তার জন্য (জান্নাতে) যা কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি তা যদি তুমি চোখে দেখতে তাহলে তুমি খুবই হাসতে এবং মোটেই দুঃখিত হতে না। অতঃপর যখন তার ঐ বন্ধু মারা যায় এবং দুই বন্ধুর রূহ মিলিত হয় তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা তোমাদের পরস্পরের সম্পর্কের বর্ণনা দাও। তখন একজন অপরজনকে বলবে- তুমি আমার খুবই ভাল বন্ধু ছিলে, অত্যন্ত সৎ সংগী ছিলে ও ছিলে অতি উত্তম দোস্ত।

পক্ষান্তরে দু'জন কাফির বন্ধু ছিলো,যারা দুনিয়ায় পরস্পর বন্ধুত্ব করে। যখন তাদের একজন মারা যায় এবং তাকে জাহান্নামের দুঃসংবাদ শুনান হয়, তখন দুনিয়ার ঐ বন্ধুর কথা তার স্বরণ হয় এবং সে বলে, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো। যে আমাকে তোমার ও তোমার নবীর অবাধ্যতার নির্দেশ দিতো। সে আমাকে মন্দ ও পাপ কাজে উৎসাহ দিতো এবং ভাল ও নেক কাজে বাধা দিতো। আর আমার অন্তরে সে এই বিশ্বাস দিতো যে, তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটবে না। সুতরাং তুমি তাকে আমার মতো সুপথ দেখাবে না, যাতে সেও জাহান্নামের দৃশ্য দেখে, যা তুমি আমাকে দেখিয়েছো। তুমি আমার প্রতি যেরূপ অসন্তুষ্ট, তার প্রতিও তুমি সেরূপ অসন্তুষ্ট থাকো। এরপর যখন তার অপর বন্ধু মারা যায় এবং উভয়ের রূহ একত্রিত হয়, তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা একে অপরের গুণাগুণ বর্ণনা করো। তখন তারা একে অপরকে বলবে- তুমি আমার খুবই মন্দ ভাই ছিলে, খারাপ সঙ্গী ছিলে এবং নিকৃষ্ট বন্ধু ছিলে।"(তাফসীরে ইবনে কাসীর। রাবী-ইমাম ইবনে হাতিম রাঃ)

অপর এক বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত মুজাহীদ (রাঃ) এবং হযরত কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে,"কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তবে আল্লাহভীরুদের বন্ধুত্ব তা হবে না।"(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

যে দু'জন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে যাদের একজন রয়েছে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে এবং অপরজন রয়েছে পশ্চিম প্রান্তে। কিয়ামতের দিন তাদের দু'জনকেই একত্রিত করে মহান আল্লাহ বলবেন, এ হলো ঐ ব্যক্তি যাকে তুমি আমারই জন্যে ভাল বাসতে।"(তাফসীরে ইবনে কাসীর। রাবী-হাফিজ ইবনে আসাকির রাঃ)

এসব কারণেই ইহকাল ও পরকাল উভয়ের জন্য উৎকৃষ্ট, উপকারী এবং কল্যাণকামী বন্ধুত্ব হলো তাই যা আল্লাহর ওয়াস্তে করা হয়।

যে দু'জন মুসলমানের বন্ধুত্ব আল্লাহর ওয়াস্তে হয় তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহানবী (সঃ) বলেন, হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না সেদিন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেয়া হবে। তাদের এক শ্রেণী হলো–

وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ -

"ঐ দু'জন ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালবাসে ও একত্রিত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই প্রয়োজনে পৃথক হয়ে যায়।"(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সুতরাং এসব বিষয় খেয়াল করেই দেখেশুনে দুনিয়াতে বন্ধুত্ব এবং দোস্তালী করা উচিত। এ সম্পর্কে মহানবী (সঃ) বলেন–

اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَا لْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ -

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার বন্ধুর ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের দেখে নেয়া উচিত, তুমি কার সাথে বন্ধুত্ব করছো।"

(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিজী। রাবী-আবু হুরাইরা রাঃ)

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন-

يٰعِبَادِ لاَخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ○ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ -

(কিয়ামতের দিন মুত্তাকীদের বলা হবে,) হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে-তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো। এটা হলো তোমাদের

ঈমান ও ইসলামের প্রতিদান। অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস ও পূর্ণ প্রত্যয়, আর বাইরে শরীয়তের উপর আ'মল।

দুনিয়াতে যারা আল্লাহকে ভয় করে চলতো। যাদের ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব ছিলো আল্লাহর ওয়াস্তে, এই আয়াত তিনটিতে তাদেরই প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে।

মু'তামার ইবনে সুলাইমান (রাঃ) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন যখন মানুষ নিজ নিজ কবর থেকে উঠবে তখন সবাই দুঃশ্চিন্তায় এবং সন্ত্রস্ত থাকবে। সেসময় একজন ঘোষক (আল্লাহর বাণী) ঘোষণা করবেন ঃ "হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।" এ ঘোষণা শুনে সবাই খুশি হয়ে যাবে। কারণ তারা এটাকে সাধারণ ঘোষণা মনে করবে (অর্থাৎ তারা মনে করবে এটা সবার জন্যই ঘোষণা)। এরপর আবার ঘোষণা করা হবে, যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে (কেবল তারাই)। এ ঘোষণা শুনে খাঁটি ও পাক্কা মুসলমান ছাড়া অন্যরা সবাই নিরাশ হয়ে যাবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা আনন্দের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করো।"

اَزْوَاجٌ-শব্দটি দ্বারা স্ত্রীরাও হতে পারে আবার একমত সম্পন্ন সহকর্মী বন্ধুরাও হতে পারে। এই শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা ঈমানদার স্ত্রীরা তো জান্নাতে যাবে তার সাথে ঈমানদার বন্ধুরাও জান্নাতে তাদের সঙ্গী হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা এসব জান্নাতীদের জান্নাতের ভোগ সামগ্রী এবং নি'য়ামতের কথা বলতে গিয়ে বলেন–

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ج وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ
الْاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْاَعْيُنُ ج وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ-

(জান্নাতে) তাদের জন্য পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং সেখানে রয়েছে মনে যা চায় এবং চোখ যাতে জুড়ায়। আর তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

আয়াতে জান্নাতে জান্নাতীদের এমন খাবার পাত্র এবং মনের মতো চোখ জুড়ানো খানা পরিবেশন করা হবে, যা দুনিয়ার জীবনে কল্পনাও করা যায়

www.icsbook.info

না। আর সেখানে প্রতিদান হিসেবে নানা প্রকারের ফলমূলও পরিবেশন করা হবে।

"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সর্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতী যে সবশেষে জান্নাতে যাবে, তার দৃষ্টি একশো বছরের দূরত্ব পর্যন্ত যাবে-আর ততো দূর পর্যন্ত সে শুধু তার নিজেরই ডেরা, তাঁবু এবং স্বর্ণ ও পান্না নির্মিত প্রাসাদ দেখতে পাবে। এগুলো সবই বিভিন্ন প্রকারের ও রঙ-বেরঙের আসবাবপত্রে পরিপূর্ণ থাকবে।

সকাল-সন্ধ্যায় বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যে পরিপূর্ণ সত্তর হাজার করে রেকাবী ও পেয়ালা তার সামনে পেশ করা হবে। ঐ গুলোর প্রত্যেকটি তার মনের চাহিদা মুতাবিক হবে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার চাহিদা একই রকম থাকবে। যদি সে সারা দুনিয়ার লোককে দাওয়াত দেয় তবে তাদের সবারই জন্যে ঐ খাদ্যগুলো যথেষ্ট হবে। অথচ ওগুলোর কিছুই কমবে না।"(ইবনে কাসীর। রাবী- আবদুর রাযযাক রাঃ)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সঃ) আরও বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন; "আমি আমার নেককার বান্দাহদের জন্যে (জান্নাতে) এমন সব নি'য়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি- যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তর তা সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে না। আর এর সত্যতার জন্য তোমরা ঐ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পার-"ফালা তা'লামু নাফসুন মা উখফিয়া লাহুম মিন কুর্‌রাতু আয়্যুনিন"। অর্থাৎ আল্লাহ চোখ জুড়ানো সেসব নি'য়ামত নেক বন্দাহদের জন্যে দৃষ্টির অন্তরাল করে রেখেছেন, যা সম্পর্কে কেউ কোন জ্ঞান রাখে না।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জান্নাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রাণ রয়েছে তাঁর কসম! জান্নাতি খাবারের একটি গ্রাস উঠাবে এবং তার মনে খেয়াল জাগবে যে, অমুক প্রকারের খাবার হলে খুবই ভাল হতো। তখন ঐ গ্রাস তার মুখে ঐ জিনিসই হয়ে যাবে যার আকাঙ্খা সে মনে মনে করেছিলো। অতঃপর তিনি (সঃ) وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ এ আয়াতটি পাঠ করেন।" (ইবনে কাসীর। রাবী-ইমাম ইবনে হাতিম রাঃ)

www.icsbook.info

মুত্তাকীদের জান্নাতের বালাখানাসহ্ অন্যান্য নি'য়ামতের কথা বলতে গিয়ে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেন, "সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতীর জন্য সাত তলা প্রাসাদ হবে। সে ষষ্ঠ তলায় অবস্থান করবে এবং সপ্তম তলাটি তার উপর থাকবে। তার ত্রিশ জন খাদেম থাকবে যারা সকাল-সন্ধ্যায় স্বর্ণ নির্মিত তিনশোটি পাত্রে তার জন্যে খাবার পরিবেশন করবে। প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা খাদ্য-খাবার থাকবে এবং ওগুলো হবে খুবই সুন্দর ও সুস্বাদু। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার খাবার চাহিদা এক রকমই থাকবে। অনুরূপভাবে তার জন্য তিনশোটি সোনার পেয়ালা, পানপাত্র ও গ্লাসে পানীয় জিনিস রাখা হবে। ওগুলোও আলাদা আলাদা জিনিস হবে। সে তখন বলবে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অনুমতি দিলে আমি সমস্ত জান্নাতীদেরকে দাওয়াত দিতাম। সবাই যদি আমার এখানে আসে তবুও আমার খাবারের মোটেই ঘাটতি হবে না'। আয়তলোচন চোখ বিশিষ্ট হুরদের মধ্য হতে তার জন্য বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে এবং তার সাথে

দুনিয়ার স্ত্রীরাও পৃথকভাবে থাকবে। তাদের এক একজন এক এক মাইল জায়গা জুড়ে বসে থাকবে। সাথে সাথে তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের নি'য়ামত চিরস্থায়ী থাকবে। আর তোমরাও এখানে চিরস্থায়ী হবে।" অর্থাৎ এখান থেকে কখনো বের হবে না এবং এখান থেকে অন্য স্থানে যাবার ইচ্ছাও পোষণ করবে না।"(ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহঃ)

"হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেন, যারা জান্নাতে যাবে তারা সর্বদা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকবে, দারিদ্রতা ও অনাহারে কষ্ট পাবে না। তাদের পোষাক পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবন শেষ হবে না। জান্নাতে এমনসব নি'য়ামত আছে যা কোন চোখ কখনো দেখেনি এবং কোন কান কখনো শুনেনি এবং কোন মানুষের ধারণায় যা কখনো আসেনি।"(তারগীর ও তারহীব)

এতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুত্তাকীদের জন্য নিজের অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়ে বলেন–

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

এটাই জান্নাত, যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কাজের প্রতিদান হিসেবে।

www.icsbook.info

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে এটা দান করেছি আমার উদার রহমতের গুণের কারণে। তার কারণ, কোন ব্যক্তিই আল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবে না। এমনকি রাসূল (সঃ)ও পারবেন না। একবার রাসূল (সঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, হে আল্লাহর নবী (সঃ)! আপনিও কি (আল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না?) প্রতিউত্তরে তিনি (সঃ) বলেছিলেন, আমিও না।"অর্থাৎ আমিও আল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবো না।

তবে হ্যাঁ, জান্নাতীদের যে শ্রেণীভেদ হবে তা তার দুনিয়ার সৎ আ'মলের ভিত্তিতেই হবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেন, জাহান্নামী তার জান্নাতের জায়গা জাহান্নামের মধ্যে দেখতে পাবে এবং দেখে দুঃখ ও আফসোস করে বলবে, 'যদি আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করতো তবে সেও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতো।' আর প্রত্যেক জান্নাতী তার জাহান্নামের জায়গা জান্নাতে দেখতে পাবে এবং তা দেখে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলবে, 'আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে হেদায়াত দান না করলে আমি সুপথ পেতাম না।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেন, প্রত্যেক লোকেরই একটি স্থান জান্নাতে রয়েছে এবং একটি স্থান জাহান্নামে রয়েছে। সুতরাং কাফির মুমিনের জাহান্নামের জায়গার ওয়ারিশ হবে এবং মুমিন কাফিরের জান্নাতের জায়গার ওয়ারিশ হবে। "আল্লাহ তা'য়ালার এটাই জান্নাত, যার অধিকারী তোমাদেরকে করা হয়েছে তোমাদের কর্মের ফলসরূপ।" এই উক্তি দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

মুত্তাকী জান্নাতীদের জান্নাতের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ জান্নাতের ফলমূল ও তরিতরকারীর বর্ণনা দিয়ে পরবর্তী আয়াতে বলেন- لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ

সেখানে রয়েছে তোমাদের জন্য প্রচুর ফলমূল, যেখান থেকে তোমরা আহার করবে।

সূরা বাকারার ২৫ নম্বর আয়াতে জান্নাতের ফলমূল সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, "আর হে নবী (সঃ)! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন ,যার নীচ

www.icsbook.info

দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফলমূল পাবে, তখনই তারা বলে উঠবে, এগুলোতো অবিকল সেই ফলমূল যা আমরা এর আগেও (দুনিয়াতে) লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফলমূল প্রদান করা হবে। আর সেখানে তাদের জন্যে পুতঃপবিত্র সঙ্গিনী থাকবে। আর তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

মোট কথা জান্নাতীরা সেখানে পরিপূর্ণ নি'য়ামতরাজিসহ মহান আল্লাহর পছন্দনীয় ঘরে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। যা উপরে বর্ণিত কুরআন এবং হাদীস থেকে বর্ণনা করা হলো।

পক্ষান্তরে খোদাবিমুখ অপরাধীদের জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন-

إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ० لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ-

নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতেই হতাশ হয়ে পড়ে থাকবে।

উপরে আয়াতসমূহে যেমন সৎ, খোদাভীরু এবং অনুগত লোকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে ও তাদের কর্মের প্রতিফল হিসেবে জান্নাত এবং জান্নাতের নি'য়ামতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তেমনি এই আয়াতে অসৎ খোদাবিমুখ আনুগত্যহীন অপরাধীদের কর্মের প্রতিফল হিসেবে জাহান্নাম এবং জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পাপীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে থাকবে। এক মূহুর্তের জন্যও তাদের ঐ শাস্তি হালকা করা হবে না। জাহান্নামে তারা হতাশ হয়ে পড়ে থাকবে। সকল প্রকারের কল্যাণ হতে তারা নিরাশ হয়ে যাবে।

জাহান্নামের অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেন, "তোমাদের দুনিয়ার এই আগুন (তাপের দিক দিয়ে) জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর নবী (সঃ)! কেন এই আগুনই কি যথেষ্ট ছিলো না? আল্লাহর রাসূল বললেন, দুনিয়ার আগুন থেকে জাহান্নামের আগুনকে (দাহিকা শক্তির দিক দিয়ে) উনসত্তর অংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর প্রতিটি অংশই আলাদা-আলাদা ভাবে দুনিয়ার আগুনের সমতুল্য।" (সহীহ বুখারী-সহীহ মুসলিম)

www.icsbook.info

একই রাবী থেকে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সঃ) জাহান্নামের আগুনের রঙ সম্পর্কে বলেন- "জাহান্নামের আগুনকে প্রথমে হাজার বছর ধরে তাপ দেয়া হয়েছিলো, ফলে তা রক্তবর্ণ ধারণ করেছিলো। তারপর তাকে আরও হাজার বছর ধরে তাপ দেয়া হয়েছিলো, ফলে তা সাদা বর্ণ ধারণ করেছিলো। পরবর্তীতে আরও হাজার বছর ধরে তাপ দেয়ার ফলে তা কালো বর্ণ ধারণ করেছিলো। ফলে তা নিবিড় ঘন কালো অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়েছে।" (জামে' আত তিরমিজী)

অবাধ্য এবং আল্লাহকে অস্বীকারকারীদের জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে 'সূরা মূলক' এর ৬ থেকে ১১ নম্বর আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ বলেন, "যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। আর সেটা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান। যখন তারা সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জণ শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে তখন তাদেরকে তার পাহারাদার সিপাহীরা জিজ্ঞেস করবে। তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিলো, কিন্তু আমরা তাতে মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ তা'য়ালা কোন কিছু নাযিল করেনি,তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে পড়ে আছো। তারা আরও বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অতএব জাহান্নামীরা দূর হোক।"

জাহান্নামীদের আরও পরিণতির কথা উল্লেখ করে সূরা হাক্কাহ এর ৩০ থেকে ৩৭ নম্বর আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ বলেন, "ফিরিশতাদের বলা হবে- ধরো একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। অতঃপর তাকে শৃংখলিত করো সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। নিশ্চয় সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিলোনা এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উৎসাহ দিতো না। অতএব, আজকে এখানে তার কোন সুহৃদয় নাই এবং কোন খাদ্য-খাবার নাই, ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ ছাড়া। আর পাপীরা ছাড়া কেউ এটা খাবে না।"

জাহান্নামীদের এসব কঠিন শাস্তির কারণে তারা হয়তো মনে করতে পারে, আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করছেন। আল্লাহ এর প্রতিউত্তরে

পরবর্তী আয়াতে বলেন- وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ

আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিলো যালিম।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন, অনেক নি'য়ামত দান করেছেন এবং তাদের সুপথ পাবার জন্য হেদায়াতের পথও দেখিয়েছেন, কিন্তু তারা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে সৎ পথে কাজে লাগায়নি,

আল্লাহর নি'য়ামত ভোগ-ব্যবহার করার পরও তারা তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং হেদায়াতের পথ দেখানোর পরও তা মানতে অস্বীকার করার মাধ্যমে নিজেরা নিজেদের জীবনের উপর বাড়াবাড়ি করে নিজেদের উপর নিজেরাই যুলুম করেছে। তাই আল্লাহপাক এখানে বলছেন, আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিলো যালিম। দুঃস্কর্মের মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে। আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম, কিতাব নাযিল করেছিলাম এবং যুক্তি প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। কিন্তু তারা তাদের হঠকারিতা, অবাধ্যতা এবং সীমালংঘন হতে বিরত হয়নি। ফলে আমি তাদেরকে এর প্রতিফল প্রত্যেকের পাওনামতো প্রদান করেছি। এটা আমার তাদের উপর যুলুম নয়। আর আমি তো আমার বান্দাহদের উপর মোটেই যুলুম করিনা।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,জাহান্নামীরা জাহান্নামের শাস্তির কারণে শেষ পর্যন্ত চিৎকার করে বলবে-

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ -

তারা (কষ্টের কারণে) চিৎকার করে বলবে, হে মালিক (জাহান্নামের দারোগা)! তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে একেবারেই নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে, তোমরা তো এভাবেই (চিরকাল) থাকবে।

হযরত ইয়ালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে মিম্বারের উপর এ আয়াতটি পড়তে শুনেন, অতঃপর তিনি বলেন যে, জাহান্নামীরা মৃত্যু কামনা করবে যাতে শাস্তি হতে নিস্তার পায়। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে এটা ফয়সালা হয়ে গেছে যে, না তাদের মৃত্যু হবে এবং না তাদের শাস্তি হালকা করা হবে।"(সহীহ বুখারী)

আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ফাতির এর ৩৬ নম্বর আয়াতে আরও বলেন-

www.icsbook.info

لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا-

"তাদের বিষয়ে এ সিদ্ধান্ত নেই যে, তারা মৃত্যু বরণ করবে। আর তাদের থেকে শাস্তি হালকা করা হবে না।"

আল্লাহ্ তা'য়ালা অন্য আর এক সূরাই এভাবে বলেন-

وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ٥ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَالْكُبْرٰى ٥ ثُمَّ لَايَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى

"ওটা (উপদেশ) উপেক্ষা করবে, যে নিতান্ত হতভাগা। সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর সেখানে সে মরবেও না এবং বাঁচবেও না।"

(সূরা আ'লা- ১১-১৩)

যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামের মালিক অর্থাৎ জাহান্নামের দারোগার কাছে আবেদন-নিবেদন করবে এই বলে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা যেন তাদের স্থায়ী ভাবে মৃত্যু ঘটিয়ে দেন, তখন অধিকর্তা প্রতিউত্তরে বলবে, হে জাহান্নামীরা! তোমরা এখানে এভাবেই থাকবে, তোমাদের আর মৃত্যু হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, مَكْث হলো এক হাজার বছর। অর্থাৎ তোমরা আর কোনদিন মরবে না, মুক্তিও পাবে না এবং এখান থেকে পালাতেও পারবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের দুস্কর্মের কথা তুলে ধরে সর্বশেষ আয়াতে বলেন- لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ

আমি তো তোমাদের নিকট হক তথা সত্য পৌঁছিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্যবিমুখ।

অর্থাৎ এসব জাহান্নামীদের দুস্কর্ম এমনই ছিলো যে, যখন তিনি তাদের সামনে সত্যকে স্পষ্ঠ ভাবে বর্ণনা করে দেন, তখন তারা তা মেনে নেয়া তো দূরের কথা, বরং তারা ওর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওসব তাদের মনে চাই না। তাই তারা হক তথা সত্যপন্থীদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। তারা অসত্য ও অন্যায়ের প্রতিই তাদের ঝোঁক এবং অসৎ পন্থীদের সাথেই খুব মিল-মহব্বত। সুতরাং সেদিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা আজ নিজেদেরকেই তিরস্কার-ভর্ৎসনা করো এবং নিজেদের উপর নিজেরায় আফসোস করো। কিন্তু সেদিন তাদের আফসোসও না কোন কাজে আসবে, আর না আসবে কোন উপকারে।

শিক্ষাঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! সূরা যুখরুফ এর ৬৯ থেকে ৭৮ নম্বর আয়াতগুলো ব্যখ্যা বিশ্লেষণ করে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় বিষয় পাওয়া যায়, তা হলো–

০ দুনিয়াতে দেখে শুনে বন্ধুত্ব এবং দোস্তালী করা উচিত। কেননা, আখিরাতে অসৎ, খোদাবিমুখ বন্ধু বা দোস্ত বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং তার সাথেই জাহান্নামে যেতে হবে। পক্ষান্তরে সৎ খোদাভীরু বন্ধু বা দোস্ত আখিরাতে নাজাতের কারণ হবে এবং তার সাথেই জান্নাতবাসী হওয়া যাবে। সুতরাং আখিরাতের কল্যাণের দিকে তাকিয়েই বন্ধুত্ব ও দোস্তালী করা উচিত।

০ আখিরাতে শাস্তির ভয় এবং দুঃখ বেদনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান এবং পরিপূর্ণরূপে আত্মসমার্পন করা।

০ স্বামী-স্ত্রী অথবা স্ত্রী-স্বামী উভয়ই যদি আল্লাহতে পূর্ণ ঈমান রাখে, সৎ, খোদাভীরু এবং পরিপূর্ণভাবে আনুগত্যশীল হয়, তাহলে তারা উভয়েই আনন্দ ও উৎফুল্লচিত্তে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

০ জান্নাতে এমন সব নি'য়ামত দেয়া হবে যাতে অন্তরে তৃপ্তিবোধ করবে এবং চোখ জুড়িয়ে যাবে। এছাড়াও মনে যা চাইবে এবং চোখ যাতে তৃপ্তি বোধ করবে তাও দেয়া হবে। আর এটা হবে চিরস্থায়ী।

০ দুনিয়ার আ'মল বা সৎ কর্মের প্রতিদান হিসেবেই জান্নাত এবং জান্নাতের যাবতীয় আহার-বিহার সহ অনাবিল সুখ-শান্তি এবং নি'য়ামত দেয়া হবে।

০ দুনিয়ার অসৎ কর্ম এবং পাপের প্রাশচিত্ত্ব হিসেবে অপরাধীদের এমন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে যার শাস্তি হবে চিরস্থায়ী। আর এতে জাহান্নামীরা হতাশ এবং নিরাশ হয়ে পড়বে।

০ জাহান্নামের এই কঠিন এবং স্থায়ী শাস্তির জন্য আল্লাহকে যালিম (নাউযুবিল্লাহ) বানানো যাবে না। কেননা, এর জন্য যারা জাহান্নামী তারা নিজেরাই যালিম। তার কারণ হলো, যদি তারা দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতো, সৎ আ'মল করতো, আল্লাহকে ভয় করে চলতো এবং পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতো, তাহলে তারা এসব কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতো না। সুতরাং তারা এসব আ'মল বা কর্ম না করে নিজেদের জীবনের উপর নিজেরাই যুলুম করেছে।

www.icsbook.info

০ জাহান্নামের কঠিন আযাব সহ্য করতে না পেরে তা থেকে বাঁচার জন্য স্থায়ীভাবে মেরে ফেলার জন্য জাহান্নামের দারোগার কাছে আপিল করা হবে, কিন্তু তা প্রত্যাখাত হবে। কেননা, মানুষের মৃত্যু একবারই হয়-দ্বিতীয়বার মরার কোন সুযোগ নেই। সেহেতু জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্যই যা কিছু করতে হবে তা দুনিয়াতে মৃত্যুর আগেই করতে হবে। মৃত্যুর পর আর কোন কিছু করার সুযোগ থাকবে না।

০ আল্লাহর যে সত্য বাণী বা সত্য বিধান তথা আল কুরআন দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, তা সত্য হিসেবে গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী আ'মল করা ও কর্ম ঠিক করে নেয়া। যদি এর ব্যত্যায় ঘটে তাহলেই পরকালে কঠিন আযাবের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে চিরকাল যন্ত্রণায় ভুগতে হবে। আফসোস করে কোন লাভ হবে না।

আহবানঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে যে দারস পেশ করা হলো, এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর দারস থেকে যেসব শিক্ষনীয় বিষয় জানতে পারলাম তা যেন দুনিয়ার জীবনে আ'মল করে মৃত্যু বরণ করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি।

www.icsbook.info

তিন

চূড়ান্ত আন্দোলনের পরই আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসে। বিজয়ের কর্মসূচী হলো হামদ, তাসবীহ ও ইস্তিগফার

সূরা আন-নসর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ○ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ○ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ○

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১) যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে ও বিজয় লাভ হবে। (২) (হে নবী সঃ!) তখন আপনি দেখবেন যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করছে। (৩) তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি বড়ই ক্ষমাশীল।

শব্দার্থ ঃ اِذَا -যখন। جَآءَ -আসবে। نَصْرُ اللّٰهِ -আল্লাহর সাহায্য। وَ -এবং/ও। اَلْفَتْحُ -বিজয়। وَرَاَيْتَ -এবং আপনি দেখবেন। اَلنَّاسَ -মানুষদের/লোকদের। يَدْخُلُوْنَ -তারা প্রবেশ করছে। فِى - মধ্যে। دِيْنِ اللّٰهِ -আল্লাহর দ্বীনের। اَفْوَاجًا -দলে দলে। فَسَبِّحْ -অতএব আপনি তাসবীহ করুন। بِحَمْدِ -প্রশংসার সাথে। رَبِّكَ -আপনার রবের। اِسْتَغْفِرْهُ -তাঁর নিকট ক্ষমা চান। اِنَّهٗ -নিশ্চয় তিনি। كَانَ -হলেন। تَوَّابًا -ক্ষমাকারী/তওবা গ্রহণকারী।

সম্বোধনঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত দ্বীনি/ইসলাম প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা / ভাইয়েরা ও বোনেরা! আসসালামু

www.icsbook.info

আলাইকুম অয়া রহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের ছোট্ট এবং সংক্ষিপ্ত সূরার মধ্য থেকে একটি সূরা তিলাওয়াত ও সরল তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে সহীহ সালামতে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

সূরার নামকরণঃ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মাদানী। অন্যান্য সূরার ন্যায় এই সূরাটিরও নামকরণ করা হয়েছে প্রতীকী হিসেবে- اِذَاجَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ এর نَصْرٌ শব্দটিকে কেন্দ্র করেই। نَصْرٌ শব্দের অর্থ-সাহায্য। এর অপর নাম 'তাওদী'। 'তাওদী' শব্দের অর্থ বিদায় করা। এ সূরায় রাসূলে কারীম (সঃ) এর ওফাত (মৃত্যু) নিকটবর্তী হবার ইঙ্গিত আছে বিধায় এর নাম 'তাওদী' হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কালঃ সকল তাফসীরকারকগণ একমত পোষণ করেছেন যে, এই সূরা পবিত্র আল কুরআনের ১১৪ টি সূরার মধ্যে সর্বশেষ নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা। এই বিষয়ে কয়েকটি বর্ণনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এটা কুরআন মাজিদের সর্বশেষ সূরা। এরপর আর অন্য কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা নবী করীম (সঃ) এর প্রতি নাযিল হয়নি।"
(সহীহ মুসলিম, নাসায়ী, তাবারানী, ইবনে আবু শাইবা, ইবনে মারদুইয়া)

সূরাটি নাযিলের সময়কাল হিসেবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস থেকে যা জানা যায় তা হলো, তিনি বলেনঃ "এই সূরাটি বিদায় হজ্জ কালে আইয়্যামে তাশরীক (১১, ১২ ও ১৩-ই জিলহজ্জ) এর মাঝামাঝি সময়ে মিনাতে নাযিল হয়। এতে নবী করীম (সঃ) বুঝতে পারেন যে, এটা বিদায়ী সূরা। সুতরাং তখনই তিনি সওয়ারী তৈরী করার নির্দেশ দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সওয়ারীতে আরোহন করে তার ঐতিহাসিক প্রখ্যাত (বিদায় হজ্জের) ভাষণ প্রদান করলেন।"
(তিরমিজী, বাজ্জার, বায়হাকী, ইবনে আবু শাইবা, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু ই'য়ালা, ইবনে মারদুইয়া)

উপরোক্ত এ দু'টো বর্ণনা মিলিয়ে পাঠ করলে এটা স্পষ্ট মনে হয় যে, 'সূরা নাসর' নাযিল হওয়া ও নবী করীম (সঃ) এর মৃত্যুর মাঝে তিন মাস

www.icsbook.info

ও কয়েক দিনের ব্যবধান ছিলো। কেননা, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিদায় হজ্জ ও নবী করীম (সঃ) এর ওফাতের মাঝে ঠিক এতটা দিনেরই পার্থক্য ছিলো।

অন্য বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই সূরাটি যখন নাযিল হয়, তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, "আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়েছে। আমার আয়ুস্কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে।"
(মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, তাবারানী, নাসায়ী, আবু হাতিম, ইবনে মারদুইয়া)

"উম্মুল মু'মিনীন, হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এই সূরাটি যখন নাযিল হয়, তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, 'এ বছর আমার ইন্তিকাল হবে'। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রাঃ) কেঁদে ফেললেন। তা দেখে নবী করীম (সঃ) বললেন, আমার বংশের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। এই কথা শুনে তিনি (ফাতিমা) হেঁসে উঠলেন।" (ইবনে আবু হাতিম, ইবনে মারদুইয়া) ইমাম বায়হাকীতেও প্রায় অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, বদরী সাহাবী অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক মুজাহীদদের সাথে হযরত উমর (রাঃ) আমাকেও সভায় ডাকতেন। এ কারণে কারো কারো মনে সম্ভবত অসন্তুষ্টির ভাব সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। একবার তাঁদের মধ্য হতে একজন আমার সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, সে যেন আমাদের সাথে না থাকে। তার সমান বয়সী ছেলেরাতো আমাদেরও আছে। তাঁর এ মন্তব্য শুনে হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে বললেন, তোমরা তো তার সম্পর্কে খুব ভাল ভাবেই জান! একদিন তিনি সবাইকে ডাকলেন এবং তাদের সাথে আমাকেও ডাকলেন, এতে আমি বুঝতে পারলাম সম্ভবত তিনি আজ তাদেরকে কিছু দেখাতে চান। আমরা তাঁর দরবারে হাযির হলে তিনি সকলকে জিজ্ঞেস করলেন-"إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ" নাযিল সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি? তখন কেউ বললেন, এর অর্থ-"যখন আল্লাহর মদদ আসবে ও আমাদের বিজয় লাভ হবে তখন আমরা আল্লাহর প্রশংসা করবো ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো।" অন্য একজন বললেন, এর অর্থ-"শহর, নগর ও দুর্গসমূহ জয় করা।" অন্যরা চুপচাপ থাকলেন।

www.icsbook.info

অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস! তোমারও কি এই মত ? আমি বললাম, 'না'। তাহলে তোমার মতামত কি ? আমি বললাম যে, এর অর্থে নবী করীম (সঃ) এর মৃত্যুর ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁকে এটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে,তাঁর ইহলৌকিক জীবন শেষ হয়ে এসেছে। সুতরাং তিনি যেন, তাঁর প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। একথা শুনে হযরত উমরা (রাঃ) বললেন, আমিও এটাই বুঝেছি।" (সহীহ বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে জরীর, ইবনে মারদুইয়া, বাগাভী, বায়হাকী ও ইবনু মুনযির।)

আল কুরআনের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ সূরা এবং সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ আয়াত ঃ বিভিন্ন বর্ণনার ভিত্তিতে মুফাস্‌সিরগণ একমত পোষণ করেন যে, পবিত্র আল কুরআনের ১১৪ টি সূরার মধ্যে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে 'সূরা আল ফাতিহা' অবতীর্ণ হয় এবং সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে 'সূরা আন নসর' অবতীর্ণ হয়।

তাছাড়া বিভিন্ন বর্ণনার ভিত্তিতে মুফাস্‌সিরিনে কিরাম একমত পোষণ করেন যে, সর্বপ্রথম আয়াত হিসেবে 'সূরা আ'লাক এর' প্রথম পাঁচটি আয়াত অবত্তীর্ণ হয়। তবে সর্বশেষ আয়াত হিসেবে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। যেমন-হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা হতে জানা যায় যে, সর্বশেষ সূরা 'আন নসর' এর পরেও কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। তবে কোন আয়াতটি সর্বশেষ আয়াত এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

হযরত ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, নবী করীম (সঃ) এর উপর সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতটি হলো- "আয়াতে কালালা" অর্থাৎ সূরা নিসা এর ১৭৬ নং আয়াত-

يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ط

(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে আয়াত দ্বারা সূদ হারাম করা হয়েছে, তাই ছিলো কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। (সহীহ বুখারী) ইমাম আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে মারদুইয়াতে হযরত উমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসেও এই আয়াতটিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এসব

www.icsbook.info

বর্ণনায় তাকে সর্বশেষ আয়াত বলা হয়নি। বলা হয়েছে সর্বশেষ আয়াত সমূহের মধ্যে একটি।

ইবনে আব্বাসের অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়- তিনি বলেন যে, সূরা বাকারার ২৮১ নং আয়াত --- وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللهِ আয়াতটি সর্বশেষ আয়াত। (নাসায়ী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে জরীর)

হযরত উবাই ইবনে কায়াবের বর্ণনা মতে সূরা আত্ তাওবার ১২৮ ও ১২৯ নং আয়াত দু'টি সর্বশেষ আয়াত।

(মুসনাদে আহমাদ, হাকেম, আল মুসতাদারাক)

সর্বশেষ আয়াতসমূহের নাযিলের ধারাবাহিকতা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, 'সূরা নাসর' বিদায় হজ্জে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর (আরাফাতে সূরা মায়িদার ৩ নং) --- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাত্র ৮০ দিন বেঁচে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবনের যখন মাত্র ৫০ দিন বাকী ছিলো তখন (সূরা নিসা এর ১৭৬ নং) 'কালালার' আয়াত-
يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ নাযিল হয়। অতঃপর ৩৫ দিন বাকী থাকার সময় (সূরা তাওবার ১২৮ ও ১২৯ নং আয়াত)
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ ---
অবতীর্ণ হয় এবং ২১ দিন বাকী থাকার সময় (সূরা বাকারার ২৮৯ নম্বর আয়াত)---وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللهِ অবতীর্ণ হয়।

(ইমাম কুরতবী)

অপর বর্ণনায় ইবনে আবু হাতিম এবং সাঈদ ইবনে যুবায়ের এর মতে নবীজীর মৃত্যু এবং এই আয়াতটির ব্যাবধান ছিলো মাত্র ৯ দিন।

(এরপরও আল্লাহ পাকই ভাল জানেন)

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য ঃ এই সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো, যে জন্য নবী করীম (সঃ) কে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিলো তার পূর্ণতা লাভ করেছে। অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহর রাসূল (সঃ)কে পাঠানো হয়েছিলো, তা পূর্ণতা লাভ করেছে বলে এই সূরায় ইংগিত বহন করে। উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

www.icsbook.info

এও প্রমাণ পাওয়া যায়, যে দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভের জন্য নবীজীকে পাঠানো হয়েছিলো সেই দ্বীন দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করতে বসেছে, এমতাবস্থায় চূড়ান্ত সাহায্য আসা শুরু হয়েছে এবং বিজয়ও সংঘটিত হয়েছে। ফলে এখন যুদ্ধ-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। লোকেরা এমনিতেই দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে। সুতরাং নবীজীর বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়ে গেছে। অতএব দুনিয়া থেকে এখন বিদায়ের পালা। তাই নবীজীকে বলা হচ্ছে- আপনার আন্দোলন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে এবং লোকেরাও দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে, তাই নবীজী আপনি এসব কৃতিত্বের জন্য নিজে গর্ব না করে বিজয়ের কর্মসূচী হিসেবে আল্লাহর প্রশংসা করুন এবং তাঁরই পবিত্রতা এবং মহিমা ঘোষণা করুন। আর দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা মহা ক্ষমাকারী। বিভিন্ন হাদীস থেকে পাওয়া যায়, সূরা নসর নাযিলের পর তিনি (সঃ) আল্লাহর বেশী বেশী তাহ্মীদ, তাহ্লীল ও তাস্বীহ পাঠ করতে থাকেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যা পরবর্তীতে ব্যাখার সময় আলোচনা করা হবে ইনসাআল্লাহ।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে মূল ব্যাখ্যা পেশ করার পূর্বে দারসের জন্য প্রয়োজনীয় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হলো। এখন আপনাদের সামনে সূরা নসরের আয়াতগুলোর ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা পেশ করছি।

সূরার প্রথমেই মহান আল্লাহ পাক বলেন- اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ

যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে।

এই বাক্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার একটি হলো- نَصْرُ اللّٰهِ 'আল্লাহর সাহায্য' আর অপরটি হলো- اَلْفَتْحُ 'বিজয়'। পুরো সূরাটির তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে দেখা যায় এবং ইতোপূর্বে ভূমিকাতেও উল্লেখিত বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, কোন একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং যে দু'টি জিনিসের প্রয়োজন হয় সে দু'টি বিষয়ই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

প্রথমটি হলো- نَصْرُ اللّٰهِ 'আল্লাহর সাহায্য'। আর এটিই সর্বপ্রথম প্রয়োজন হয়। কেননা, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন ব্যক্তি কেন কোন নবীর পক্ষেই তাঁর দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এজন্যই নবীজী (সঃ) দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বার বার আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন। তাই নবুয়াতী জিন্দেগীর ২৩ বছর আল্লাহর সাহায্যের ফলে কাফির, মুশরিক এবং মুনাফিকদের বিভিন্ন আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করে সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌছে যান এবং আল্লাহর চূড়ান্ত সাহায্যও এসে হাজির হয়ে যায়। সুতরাং যুগে যুগে যারাই দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন-সংগ্রামে নিয়োজিত থাকবে- তাদের সকলেরই চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন হবে। কেননা, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া নিজেদের বুদ্ধি-কৌশল, শক্তি-সামর্থ, লোকবল এমনকি আধুনিক মারণাস্ত্র দ্বারাও কাফির এবং খোদাদ্রোহী শক্তির উপর বিজয় লাভ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব হয়নি ওহী দ্বারা পরিচালিত নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর পক্ষেও।

দ্বিতীয়টি হলো- 'اَلْفَتْحُ' 'বিজয়'। এই 'বিজয়' শব্দটি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (সঃ) কোন যুদ্ধ-সংগ্রাম করছিলেন তারই বিজয়। একথাটি এজন্যই উল্লেখ করা হলো যে, আমাদের সমাজে এবং আমাদের পূর্ববর্তীরাও মনে করে থাকেন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আন্দোলন-সংগ্রাম এসব বিষয় হলো দুনিয়াবী বিষয়। ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী বিষয়। ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং নবীজীও ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ। তিনি তাস্বীহ-তাহ্লীল আর মসজিদে বসে বসে দ্বীনের সবক দেয়ার জন্যই দুনিয়াতে এসেছিলেন। তাদের এসব কাল্পনিক কথা এবং দায়িত্ব এড়ানো ও ঝুঁকি-ঝামেলা, ত্যাগ-কুরবানীকে এড়িয়ে চলার মানসিকতাকে খন্ডন করা হয়েছে।

সমাজ থেকে অন্যায় অশান্তি, খুন-খারাবী, পাপাচার, যুলুম-নির্যাতন নির্মূল করার পথই তো হলো যুদ্ধ-জিহাদ ও আন্দোলন-সংগ্রাম। এর বিকল্প কোন পথেই তা হতে পারে না। এজন্যই সকল নবী রাসূলগণই প্রতিষ্ঠিত সমাজপতি এবং খোদাদ্রোহী যালিম শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্রাম করেছেন। আল্লাহ পাকও নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সূরা তাওবা, সূরা সফ্ এবং সূরা ফাতাহ্তে তা উল্লেখ করে বলেন–

www.icsbook.info

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ -

"তিনিই আল্লাহ! যিনি তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হুদা তথা জীবন ব্যবস্থা এবং সত্যদ্বীন তথা ইসলাম সহকারে, যাতে করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মতবাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারেন। যদিও তাতে মুশরিকদের গাত্রদাহ হোক না কেন।"

সুতরাং নবী করীম (সঃ) আল্লাহর দ্বীন আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠার জন্য নবুয়্যত প্রাপ্তির পর থেকে দীর্ঘ ২৩ বছর তৎকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠিত শক্তি কাফির, মুশরিক এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। আর তখনই আল্লাহর চূড়ান্ত সাহায্য এসে হাজির হয়েছে এবং তিনি বিজয় লাভ করেছেন। এই বিজয় কিন্তু আল্লাহর নবী হওয়ার পরেও এমনি এমনি আসেনি। তাঁকে এবং তাঁর আন্দোলনের সঙ্গী-সাথীদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে অর্থ-সম্পদ, আরাম-আয়েশ এবং জীবনের চূড়ান্ত কুরবানীর মাধ্যমেই বিজয় অর্জন করতে হয়েছে। এই বিজয় বলতে কোন একটি বিশেষ যুদ্ধে জয় লাভ নয়। প্রকৃতপক্ষে এই বিজয় বলতে সার্বিক এবং চূড়ান্ত বিজয়। একটি আন্দোলনের বিজয়, দ্বীনের পরিপূর্ণ বিজয়। এ এমন এক বিজয়, যার পরে গোটা দেশে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোন শক্তির অস্তিত্বই থাকবে না এবং একথা স্পষ্ট ও অকাট্য হয়ে উঠবে যে, আরব জাহানে ইসলাম-ই বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে।

তাফহীমুল কুরআন ছাড়া অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ যেমন- ইবনে কাসীর, মা'য়ারিফুল কুরআন, ফীযিলালিল কুরআন ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থে বিভিন্ন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে এ বিজয় বলতে মক্কার বিজয়কে বুঝিয়েছেন। মাওলানা মওদুদী (রহঃ) তাঁর তাফহীমূল কুরআনে এর বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বলেন, মক্কা তো ৮ম হিজরী সনে বিজয় হয়। আর এই সূরাটি নাযিল হয় ১০ম হিজরী সনের শেষ ভাগে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)ও হযরত সার্‌রা বিনতে নাবহানের বর্ণনা হতে এ কথা জানা গেছে তাছাড়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) কথানুযায়ী এই সূরাটি যদি সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হয়ে থাকে, তা হলেও এই বিজয় অর্থ মক্কা

বিজয় হতে পারে না। কেননা, সূরা তাওবা নাযিল হয়েছে মক্কা বিজয়ের পর। তাহলে 'সূরা নসর' সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা কিভাবে হতে পারে? অবশ্য মক্কা বিজয়ও যে এক চূড়ান্ত বিজয় ছিলো তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, এই বিজয়-ই আরবের কাফির-মুশরিকদের ইসলামের বিরোধিতা ও শত্রুতা করার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদ্যোগহীন এবং হতাশ করে দিয়েছিলো। কিন্তু তার পরেও তাদের মধ্যে কিছুনা কিছু শক্তি অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিলো, যার ফলে 'তায়িফ' এবং 'হুনাইনের' যুদ্ধ মক্কা বিজয়ের পরেই সংঘটিত হয়েছিলো এবং ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য মক্কা বিজয়ের পর আরও দু'টি বছর সময় লেগে গিয়েছিলো। অতএব এখানে শুধু মক্কা বিজয়কেই 'বিজয়' বলা হয়নি বরং আরব জাহানে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের কথাই এখানে বলা হয়েছে। (আল্লাহই বেশী ভাল জানেন)

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা পরবর্তী আয়াতে বলেন-

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا ۙ

(হে নবী।) তখন আপনি দেখবেন যে, দলে দলে লোকেরা আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে।

এই আয়াতে আল্লাহ পাক মহানবী (সঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে নবী (সঃ) যখন আল্লাহর সাহায্য এবং চূড়ান্ত বিজয় এসে যাবে, তখন আপনাকে দ্বীনের মধ্যে প্রবেশের জন্য মানুষকে আর কষ্ট করে বুঝানো লাগবে না। শত্রুদের মোকাবেলা করা লাগবে না। মানুষের একজন দুজন করে ইসলামে প্রবেশ করার যুগ পার হয়ে গিয়ে এমন যুগের সূচনা হবে, যখন একজন দু'জন নয়, বরং এক একটা গোত্র এবং এক একটা অঞ্চলের মানুষ কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও প্রতিবন্ধকতা ছাড়ায় নিজেদের আগ্রহেই ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে। ৯ম হিজরী সনের শুরুতেই এই অবস্থা শুরু হয়েছিলো। এ কারণেই ইতিহাসে এবছরকে "প্রতিনিধি দল আগমনের বছর" বলা হয়। এই বছর আরবের বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিনিধির পর প্রতিনিধিদল নবী করীম (সঃ) এর খেদমতে এসে ভিড় জমাতে থাকে এবং নবী করীম (সঃ) এর মুবারকপূর্ণ হাতে হাত রেখে ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করে।

হযরত ইবনে আব্বাস(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ(সঃ)

মদীনায় অবস্থান করছিলেন, এমতাবস্থায় একদিন তিনি বললেন–
اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ 'আল্লাহ মহান' 'আল্লাহ মহান'! আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে। ইয়ামিনের অধিবাসীরা এসে গেছে। তখন একটি লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর নবী (সঃ) ইয়ামিনবাসীরা কেমন লোক ? তিনি উত্তরে বললেন, তারা কোমল হৃদয়ের ও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের লোক। ঈমান,বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশল এ সবই ইয়ামিনবাসীদের রয়েছে।' (ইমাম ইবনে জরীর রহঃ)

তাফসীরে মা'য়ারিফুল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যা এমন প্রচুর ছিলো, যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর রিসালাত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু কুরাইশদের ভয়ে অথবা অন্য কোন কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলো। মক্কা বিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সেমতে তারা ইসলামে দলে দলে প্রবেশ করে। ইয়ামিন থেকে সাতশো লোক ইসলাম কবুল করে পথে আজান দিতে দিতে এবং কুরআন পাঠ করতে করতে মদীনায় এসে উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবেরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়।

তাফহীমূল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, নবী করীম (সঃ) যখন ১০ম হিজরী সনে বিদায় হজ্বে গমন করছিলেন, তখন সমগ্র আরব ইসলামের অধীনতা গ্রহণ করেছিলো এবং সারা দেশে একজন লোকও মুশরিক ছিলো না।

(আলহামদু লিল্লাহ!)

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা মহানবী (সঃ) এর এই চূড়ান্ত ও মহা বিজয়ের কর্মসূচী হিসেবে উল্লেখ করে পরবর্তী আয়াতে বলেন–

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

অতএব (হে নবী সঃ!) তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি বড়ই ক্ষমাশীল।

এই আয়াতে আল্লাহর সাহায্য এসে গেলে এবং বিজয় সংঘটিত হলে বিজয়ের তিনটি কর্মসূচী দেয়া হয়েছে। প্রথম কর্মসূচী হলো- তাসবীহ করা, দ্বিতীয় কর্মসূচী হলো- প্রশংসা করা, এবং তৃতীয় কর্মসূচী হলো-

www.icsbook.info

ইস্তিগফার করা বা ক্ষমা চাওয়া। বিজয়ের এই তিনটি কর্মসূচী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং অর্থবহ। যেমন–

প্রথম কর্মসূচী ঃ حَمْدٌ (হামদ) অর্থ হলো- আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা, স্ততিবাদ করা। তার সাথে তাঁরই শুকরিয়া আদায় করা, আন্তরিক ও অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

দ্বিতীয় কর্মসূচী ঃ تَسْبِيْحٌ (তাস্‌বীহ্) অর্থ হলো- আল্লাহ তা'য়ালাকে সবদিক থেকে মহাপবিত্র ও দোষ-ত্রুটি এবং দূর্বলতা হতে মুক্ত বলে ঘোষণা করা। এ কথা উদাত্ত কণ্ঠে বলা যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা সব রকমের দোষ-ত্রুটি, দূর্বলতা এবং শরিকানা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। তিনি এসব কিছুর অনেক উর্দ্ধে।

হে নবী (সঃ)! আপনার আন্দোলন-সংগ্রামের দ্বারপ্রান্তে এসে আপনার রব এর কুদরতের এই অসাধারণ কীর্তি যখন প্রত্যক্ষ করবেন, তখন তাঁর হামদ সহকারে তাঁর তাসবীহ্ করবেন। এখানে 'হামদ' করার অর্থ হলো- এই বিরাট সফলতা আপনার নিজস্ব যোগ্যতা-ক্ষমতার ফলে হয়েছে এমন সামান্য পরিমান ধারণাও যেন কখনো আপনার মনে স্থান না পায়। বরং মনে যেন এটাই স্থান পায় যে, একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ এবং দয়ার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। আর এটাও স্বীকৃতি দেয়া যে, এই সাফল্যের গৌরব একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার। তিনিই এজন্য সকল প্রকার প্রশংসা পাবার অধিকারী।

আর 'তাস্‌বীহ্' করার অর্থ হলো- আল্লাহর দ্বীনের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ হে নবী (সঃ) আপনার নিজের চেষ্টা ও সাধনা বা তার উপর নির্ভরশীল এটা হতে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। বরং আপনার মনে-প্রাণে কেবল এই চিন্তাই রাখবেন যে, আপনার চেষ্টা-সাধনার সাফল্য আল্লাহর মদদ ও সাহায্যের উপরই নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে একাজ তাঁর যে কোন বান্দার দ্বারা করাতে পারতেন। এটাও আল্লাহর মেহেরবানী যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই মহান কাজটি আপনাকে দিয়েই করিয়েছেন। আর হে নবী (সঃ)! এটাও মনে রাখবেন যে, মহান আল্লাহ সকল প্রকার ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দূর্বলতা থেকে মুক্ত। কাজেই আপনি কেবল তাঁরই কুদরতের তাস্‌বীহ্ করুন।

তৃতীয় কর্মসূচী ঃ اِسْتِغْفَارْ (ইস্তিগফার) এর অর্থ হলো-"ক্ষমা প্রার্থনা করা"। এই ক্ষমা চাওয়ার কর্মসূচীতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীকে এই শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, হে নবী (সঃ)! আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে এই দোয়া করবেন, আপনাকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো তা সম্পূর্ণ করার বিষয়ে আপনার দ্বারা মানুষ হিসেবে যে ভুল ত্রুটি হয়ে গেছে, কিম্বা তাতে যে অসম্পূর্ণতা ও দূর্বলতা রয়ে গেছে তা যেন তিনি ক্ষমা করে দেন, সেই দিকে যেন তিনি ভ্রুক্ষেপ না করেন, তা যেন তিনি ধরে না বসেন এবং সেই জন্য যেন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে না হয়।

প্রকৃত পক্ষে ইসলাম বান্দাকে এই বিনয় ও এই রীতি-নিয়মই শিক্ষা দিয়েছে যে, আল্লাহ কোনো বান্দাহর দ্বারা তার দ্বীনের যতো বড় কাজই করিয়ে নিক না কেন, এই ব্যাপারে আল্লাহর পথে যে যতো বড় ত্যাগ-কুরবানী করে থাক না কেন, তাঁর বন্দেগী করার জন্য যতো কষ্ট স্বীকার করে থাকুক না কেন, সে যেন এক মুহুর্তের জন্যও এই কথা না ভাবে যে, তার উপর আল্লাহর যে হক বা অধিকার ছিলো তা সে পুরোপুরি আদায় করে ফেলেছে। বরং সদা সর্বদা সে যেন মনে করে যে, আমার উপর যে দ্বায়িত্ব-কর্তব্য ছিলো, তা আমি কিছুই করতে পারিনি। বরং আল্লাহর নিকট এই দোয়াই করা উচিত যে, আল্লাহর হক আদায় করার ব্যাপারে আমার দ্বারা যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তিনি যেন তা ক্ষমা করে দিয়ে আমার সামান্যতম চেষ্টা এবং কাজটুকু কবুল করে নেন।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর পথে চেষ্টা, শ্রম, কষ্ট ও ত্যাগ-কুরবানী স্বীকার করার ক্ষেত্রে নবী করীম (সঃ) এর চেয়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে বেশী অগ্রসর মনে করার কোনই সুযোগ নেই। তা সত্যেও তাঁকেই যখন এই নম্রতা ও বিনয়তা শিখানো হয়েছে, তখন এমন কে আছে যে নিজের কাজকে বিরাট কিছু মনে করতে পারে এবং আল্লাহর প্রতি তার যে করণীয় ছিলো তা সে করে ফেলেছে বলে সামান্যতমও গর্ববোধ করতে পারে?

'ইস্তিগফার'-এর এই ফরমান দ্বারা মুসলমানদেরকে চিরস্থায়ী শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, কোনো ইবাদত-বন্দেগী, ত্যাগ-তিতীক্ষা এবং কোনো খিদমতকে মোটেই বড় করে দেখা উচিত নয়। বরং নিজের ধন-সম্পদ, জীবন-প্রাণ আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দেবার পরেও মুমিন মুসলমানদের

মনে করা উচিত যে, যা তার কর্তব্য ছিলো তার তো কিছুই করতে পারলাম না।

অনুরূপভাবে মুসলমানদের যখন কোনো বিজয় লাভ হবে তখন তা নিজের ক্ষমতা-যোগ্যতার ফলে সংঘটিত হয়েছে এমন মনোভাব মনে স্থান না দিয়ে, আত্মতৃপ্তিবোধ না করে এবং আনন্দ-ফূর্তি না করে বরং যা কিছু হয়েছে তা আল্লাহর অনুগ্রহেই হয়েছে মনে করা এবং কোন প্রকার গর্ব-অহংকার মনে স্থান না দিয়ে আল্লাহর সামনে বিনয়ের মস্তক অবনত করে তারই প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন করা। তারই তাস্‌বীহ্-তাহ্‌লীল করা এবং তারই নিকট তাওবা ইস্তিগফার করা একান্ত করণীয় কর্তব্য।

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, মহানবী (সঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে এই নির্দেশ পাবার পর বেশী বেশী তাহমীদ, (প্রশংসা) তাসবীহ্ (পবিত্রতা) এবং ইস্তিগফার করা শুরু করে দেন।

হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) তার ইন্তিকালের পূর্বে এই দোয়া খুব বেশী করে পড়তেন -

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

অন্য বর্ণনা অনুযায়ী এ দোয়াটি এ রকম ছিলো -

سُبْحٰنَ اللهِ وَ بِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

আমি জানতে চাইলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি এখন এ কিসব কথা পড়তে শুরু করেছেন? তখন তিনি বললেন, আমার জন্য একটি নিদর্শন ঠিক করে দেয়া হয়েছে, আমি যখন তা দেখবো, তখন যেন আমি এই কথাগুলি বলি এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর সে নিদর্শন হলো -

اِذَاجَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ

(মুসনাদে আহমাদ,মুসলীম, ইবনে জরীর,ইবনুল মুনযীর,ইবনে মারদুইয়া)

হযরত আয়িশা (রাঃ) এর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) রুকু ও সাজদায় খুব বেশী করে এই দোয়াটি পড়তেন -

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

আর এটাই ছিলো কুরআনের (সূরা নসর এর) ব্যাখ্যা। নবী করীম (সঃ) নিজেই এই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

(সহীহ বুখারী-মুসলীম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে জরীর)

www.icsbook.info

উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এই সূরা নাযিলের পর নবী করীম (সঃ) উঠতে-বসতে, চলতে ফিরতে সকল অবস্থায় এই দোয়া- سُبْحٰنَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُاللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ পাঠ করতেন। আমি তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, হে নবী (সঃ) আপনি কেন এই কথাগুলি প্রায়ই বলতে থাকেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমাকে এটা করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি এই সূরাটি (নসর) পাঠ করলেন। (ইবনে জরীর)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, এই সূরা নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। যার ফলে তাঁর পা দু'টি ফুলে যেত। (কুরতুবী)

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! পবিত্র আল কুরআনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সূরা নসর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা যেসব বিষয় শিক্ষা লাভ করলাম তা হলো –

○ বিজয় শব্দটির দ্বারা একথায় প্রমাণিত হলো যে, এই বিজয়ের পেছনে কোন একটি যুদ্ধ-সংগ্রাম জড়িত রয়েছে। সুতরাং নবীজীকে একটি মিশন নিয়ে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল। আর সেই মিশন ছিলো আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। নবীজীর উপর সেই অর্পিত মিশন আল্লাহর দ্বীন বিজয়ের জন্য দীর্ঘ যুদ্ধ-আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়েছে। সুতরাং যুগে যুগে দ্বীন বিজয়ের জন্য সকল মুসলমানকে আন্দোলন-সংগ্রামের সাথে জড়িত থাকতে হবে। এই কঠিন পথ ছাড়া অন্য কোনো সহজ কিম্বা বাঁকা-চোরা পথে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয় এবং জান্নাত পাওয়াও সম্ভব নয়। যা আল্লাহর প্রিয় হাবীব শ্রেষ্ঠ মানব আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে এই কঠিন পথেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয়েছে। যাঁর কষ্ট, ত্যাগ-কুরবানীর বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান।

○ আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় তখনই আসবে যখন আন্দোলন-সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছবে। এই জন্য ধৈর্য সহকারে আল্লাহর সাহায্য এবং চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য অবিরাম গতিতে প্রাণান্তকর চেষ্টা-সংগ্রাম চালিয়ে

যেতে হবে। যেমন নবী করীম (সঃ) কে দীর্ঘ তেইশটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে দ্বীন যদি বিজয় নাও হয় তবুও তা ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করা যাবে না। যেমন অতীতের নবীরা ব্যর্থ হননি। কেননা, কোন কোন নবীতো নয়শো/হাজার বছর চেষ্টা করেও নিজের পরিবারেরই সকল সদস্যকে মুসলমান বানাতে পারেননি। এজন্য তো তাঁদের নবুয়্যাত ক্যানসিল হয়ে যায়নি। বরং তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা-সংগ্রাম করে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। সুতরাং অতীতের নবী রাসূলের অনুসারী হিসেবে আমাদেরকেও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে- এতে দ্বীন বিজয় হোক বা না হোক। হতাশ হয়ে আন্দোলন থেকে কেটে পড়া যাবে না। কেননা, দ্বীন কায়েম করার দ্বায়িত্ব আল্লাহ তা'লার। আর চেষ্টা-সাধনা করার দায়িত্ব বান্দাহর। দ্বীন কায়েম না হলেও এর প্রতিদান আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্ট হয়ে বান্দাহকে পরকালে পরিপূর্ণভাবে দান করবেন।

০ দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছিয়ে যদি আল্লাহর সাহায্য এসে যায়, আর দ্বীনের বিজয় হয়ে যায়, তাহলে সেই বিজয়ের জন্যে আত্ম হারা হওয়া যাবে না, আনান্দ-উল্লাসও করা যাবে না, হাততালি দিয়ে আর নাচানাচি করে শয়তানকে খুশি করা যাবে না, আত্ম অহংকার ও গর্ববোধ করাও যাবে না এবং আত্মতৃপ্তিবোধও করা যাবে না। বরং এই বিজয়ের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া ও সাহায্যের কথা স্মরণ করে তারই প্রশংসা করতে হবে, তারই শুকরিয়া আদায়ের জন্য সাজদায় লুটিয়ে পড়তে হবে, তারই প্রশংসা করতে হবে, তারই কৃতিত্বের কথা স্মরণ করে তারই তাস্‌বীহ তাহ্‌লীল করতে হবে। আর আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে ব্যক্তিগত ও দলীয়ভাবে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি এবং বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। রুকুতে, সাজদাতে, নামাজের পরে এবং চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে সর্বাবস্থায় আল্লাহর তাহমীদ (প্রশংসা) তাস্‌বীহ (পবিত্রতা) বর্ণনা করতে হবে এবং তাঁরই কাছে তাওবা-ইস্তিগফার করতে হবে, যেভাবে এবং যে ভাষায় নবী করীম (সঃ) করেছিলেন। যা ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে।

০ দ্বীন বিজয়ের পর দ্বীনকে সমাজে টিকিয়ে রাখার জন্য যেমন চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে তেমনি বাতিল এবং শয়তানি শক্তির ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়ে দ্বীন যেন আবার পরাভূত না হয়ে যায়, তার জন্য সার্বক্ষণিক

www.icsbook.info

সাবধান-সতর্ক থাকতে হবে। সাথে সাথে বেশী বেশী ইবাদাত-বন্দেগীতে মনোনিবেশ করতে হবে।

আহ্‌বান ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছোট্ট একটি সূরার যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হলো, এতে যদি আমার অজান্তে এবং অজ্ঞাতে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সাথে সাথে এই সূরায় যেসব শিক্ষানীয় বিষয় অবগত হলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমরা আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। অয়াআখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

www.icsbook.info

ঝুঁকিপূর্ণ আন্দোলন থেকে এড়িয়ে থাকার বাহানা তালাশ না করা। আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রীর অগ্রাধীকার না দেয়া। সকল অবস্থায় আন্দোলনের নেতৃত্বকে সাহায্য করা এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী থাক বা না থাক জিহাদের ডাক আসলে ঝাঁপিয়ে পড়া।

সূরা আত্ তাওবাহ ৩৮-৪১ আয়াত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ
اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ
فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝ اِلَّا تَنْفِرُوْا
يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ
شَيْئًا ؕ وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ
اللهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ
اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهٗ
عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَكَلِمَةُ اللهِ هِىَ الْعُلْيَا ؕ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝
اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ
سَبِيْلِ اللهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (৩৮) হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হলো, যখন তোমাদেরকে (জিহাদের জন্য) আল্লাহর পথে বের হতে বলা হয়, তখন

www.icsbook.info

তোমরা মাটি আকড়ে ধরো (অর্থাৎ অলস ভাবে বসে থাকো)। তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের এসব ভোগ বিলাসের উপকরণ অতি নগণ্য। (৩৯) যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের কঠোর শাস্তি দেবেন (অর্থাৎ ধ্বংস করে দেবেন) এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আর তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (৪০) তোমরা যদি তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য না করো, তবে মনে রেখো, আল্লাহই (তাঁর সাহায্য করবেন, যেমন তিনি) তাঁর সাহায্য করেছিলেন সেই সময়, যখন কাফিররা তাঁকে দেশ ছাড়া করেছিলো- তখন তিনি ছিলেন মাত্র দু'জনের একজন। যখন তাঁরা দু'জন গুহার মধ্যে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গী (আবু বকর রাঃ) কে বললেন, চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি গভীর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাঁকে সাহায্য করলেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে, যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ কাফিরদের কথাকে নীচু করে দিলেন, আর আল্লাহর কথাতো সর্বোচ্চই এবং আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ। (৪১) তোমরা বের হয়ে পড়ো- হালকাভাবে (অর্থাৎ স্বল্প সরঞ্জামের সাথে) কিম্বা ভারী-ভারাক্রান্ত ভাবে (অর্থাৎ প্রচুর সাজ-সরঞ্জামের সাথে) আর জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-মাল ও জান-প্রাণ দিয়ে, এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বোঝ।

শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا -ওহে/হে। اَلَّذِيْنَ -যারা। مَالَكُمْ -তোমাদের কি হয়েছে/হলো। اِذَا -যখন। قِيْلَ -বলা হয়। لَكُمْ -তোমাদেরকে। اِنْفِرُوْا -তোমরা বের হও। فِىْ سَبِيْلِ اللهِ -আল্লাহর পথে। اثَّاقَلْتُمْ -তোমরা বোঝায় নূয়ে পড়ছো। اِلَى الْاَرْضِ -যমীনের দিকে/উপরে। اَرَضِيْتُمْ -তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -দুনিয়ার জীবন নিয়ে। مِنَ الْاٰخِرَةِ-আখিরাতের পরিবর্তে/বিনিময়ে। فَمَا -অথচ নয়। مَتَاعُ -সামগ্রী। اِلَّا -ছাড়া/ব্যতীরেকে। قَلِيْلٌ -অতি নগণ্য/তুচ্ছ। اِلَّا -যদি না। تَنْفِرُوْا -তোমরা বের হও। يُعَذِّبْكُمْ -তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন। اَلِيْمًا - বড় কষ্ট/ যন্ত্রণা দায়ক। وَ - এবং/ও। يَسْتَبْدِلْ -

www.icsbook.info

পরিবর্তন করবেন। قَوْمًا - অন্য জাতি/লোক। غَيْرَكُمْ - তোমাদের ছাড়া/স্থলে। لَاتَضُرُّوْهُ -তোমরা তার ক্ষতি করতে পারবে না। شَيْئًا - কিছুমাত্র। عَلٰى -উপর। كُلِّ -প্রত্যেক। شَيْئٍ -কিছুর। قَدِيْرٌ -ক্ষমতাবান। تَنْصُرُوْهُ -তোমরা তাকে সাহায্য করো। فَقَدْ -নিশ্চয়ই। نَصَرَهُ اللّٰهُ - আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। اِذْ -যখন। اَخْرَجَهُ -তাকে বহিস্কার বা বের করে দিয়েছিলো। ثَانِيَ -দ্বিতীয়। اِثْنَيْنِ -দু'জনের। هُمَا -তারা দু'জন। فِيْ -মধ্যে। الْغَارِ -গুহায়। يَقُوْلُ -তিনি বলেছিলেন। لِصَاحِبِهٖ -তাঁর সঙ্গীকে। لَاتَحْزَنْ -চিন্তিত/বিষণ্ন হবেন না। اِنَّ -নিশ্চয়। مَعَنَا - আমাদের সাথে। فَاَنْزَلَ اللّٰهُ -অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন। سَكِيْنَتَهٗ -তার প্রশান্তি। عَلَيْهِ -তাঁর উপর। اَيَّدَهٗ -সাহায্য দিলেন/করলেন। بِجُنُوْدٍ -সৈন্য দিয়ে। لَمْ تَرَوْهَا -যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। جَعَلَ -করলেন। كَلِمَةَ -কথাকে। كَفَرُوْا -কুফরী করেছিলো। السُّفْلٰى - নীচু। هِيَ -তা। الْعُلْيَا -সমুন্নত/উঁচু। عَزِيْزٌ -মহাপরাক্রমশালী। حكيم - মহাবিজ্ঞ। اِنْفِرُوْا -তোমরা বের হও। خِفَافًا -হালকা অবস্থায়। ثِقَالًا - ভারী অবস্থায়। جَاهِدُوْا -তোমরা লড়াই করো। بِاَمْوَالِكُمْ -তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে। اَنْفُسِكُمْ -তোমাদের জান-প্রাণ। ذٰلِكُمْ -তোমাদের ওটাই/এটাই। خَيْرٌ - উত্তম। لَكُمْ -তোমাদের জন্যে। اِنْ -যদি। كُنْتُمْ - তোমরা। تَعْلَمُوْنَ -জানতে/অবগত হতে।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে/মাহফিলে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা। আসসালামু আ'লাইকুম। আমি আপনাদের খিদমতে সূরা তাওবার ৩৮ থেকে ৪১ নং পর্যন্ত মোট চারটি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাকে সহীহ সালামতে আপনাদের সামনে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরাটি দু'টি নামে পরিচিত। একটি হলো 'তাওবাহ'। আর অপরটি হলো 'বারা'আত'।

www.icsbook.info

তাওবাহ্ নামকরণ ঃ এই সূরাটি 'তাওবাহ্' নামকরণের কারণ হলো এই যে, এই সূরার এক স্থানে কতিপয় ঈমানদার লোকদের তাওবা কবুল করে তাদের অপরাধ মাফ করে দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বারা'আত নামকরণ ঃ এই সূরাটি 'বারা'আত' নামকরণের কারণ হলো এই যে, সূরার শুরুতে মুমিনদেরকে মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বার'আত অর্থ-সম্পর্ক ছেদ বা ছিন্ন। তবে যে নামই হোক না কেন তা প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবেই করা হয়েছে। কোন শিরোনাম হিসেবে নামকরণ করা হয়নি।

সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লিখার কারণ ঃ সূরাটির শুরুতে অন্যান্য সূরার ন্যায় 'বিসমিল্লাহির রহমানীর রাহীম' লিখা হয়নি। এর কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞ তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ পাক মুশরিকদের আচারণে রাগান্বিত হয়ে সূরাটি নাযিল করেন, তার জন্য তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলেননি। আবার কেউ বলেন যে, পূর্ব সূরা 'আনফালের' জের। তাই আর বিসমিল্লাহর প্রয়োজন হয় না।

ইমাম রাযী (রহঃ) যে কারণটি উল্লেখ করেছেন, সেটিই হলো সবচেয়ে বেশী সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। তা হলো, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখেননি। তাই পরবর্তীতে সকলেই তাঁর অনুকরণ করেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ তিলায়াতের সময় সূরার শুরু থেকে আরাম্ভ করলে 'বিসমিল্লাহ' পড়া যাবে না। তবে যদি সূরার মাঝপথ থেকে তিলাওয়াত আরাম্ভ করা হয় তবে 'বিসমিল্লাহ' দিয়েই যথারীতি তিলাওয়াত শুরু করতে হবে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় ঃ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে 'মাদানী'। তবে একই ভাষণে একই সময় অবতীর্ণ হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পরিপেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সূরাটি তিনটি ভাষণে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রথম ভাষণ ঃ সূরার শুরু থেকে ৫ম রুকু পর্যন্ত চলেছে। এই অংশটুকু নাযিল হওয়ার সময় হলো ৯ম হিজরীর যিলক্বদ মাস বা তার কাছাকাছি সময়। এ বছর নবী করীম (সঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে 'আমীরুল হজ্জ' বা হজ্জ কাফিলার নেতা করে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় এই ভাষণটি অবতীর্ণ হয়। নবী করীম (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে এই

ভাষণটি হাজীদের পাঠ করে শোনানোর জন্য মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এই ভাষণে মুশরিকদের সাথে মুমিনদের সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষণ ঃ এই ভাষণটি ৬ষ্ঠ রুকুর শুরু হতে ৯ম রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটা ৯ম হিজরীর রজব মাস বা তার কিছু আগে অবতীর্ণ হয়, যখন নবী করীম (সঃ) তৎকালীন পরাশক্তি রোমান সম্রাজের বিরুদ্ধে তাবুক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এখানে প্রকৃত ঈমানদারদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং দূর্বল মুমিন এবং মুনাফিকদের তিরস্কার করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাষণ ঃ সর্বশেষ এই ভাষণটি ১০ম রুকু থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটি তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নাযিল হয়। এই অংশে এমন কতকগুলো আয়াত রয়েছে যা বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়। বিভিন্ন অংশের বিষয় একই হওয়ার কারণে অহীর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই ভাষণের সাথে সংযোগ করে দিয়েছেন। এতে মুনাফিকদের তাম্বীহ করা হয়েছে এবং তাবুক যুদ্ধে না যেয়ে যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিলো তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আর যেসব লোক ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও জিহাদে অংশ গ্রহণ করেনি তাদের তাওবা কবুল করে ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

সূরাটির বিশেষ দিক ঃ তিনটি ভাষণ নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতার দৃষ্টিতে প্রথম ভাষণটি স্থান সূরার সর্বশেষে হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বের বিবেচনায় উহার স্থান সর্বপ্রথমে হওয়ার কারণে নবী করীম (সঃ) সূরাতে সংযোজনকালে উহাকেই প্রথমে স্থান দিয়েছেন। তবে যা কিছু করা হয়েছে তা ওহীর নির্দেশনায় করা হয়েছে। নিজের ইচ্ছায় তিনি কোন কিছু করেননি।

সূরার বিষয়বস্তু ঃ

০ সূরার প্রথম অংশে অর্থাৎ ২৮ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানদেরকে মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হয়েছে।

০ দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ ২৯ নম্বর আয়াত থেকে ৩৫ নম্বর আয়াতে 'আহলি কিতাব' তথা ইহুদী নাসারাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছেদের কথা বলা হয়েছে।

www.icsbook.info

০ তৃতীয় অংশে অর্থাৎ ৩৮ থেকে ৪১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, তাবুক যুদ্ধে যাবার জন্য সাধারণ নির্দেশ আসার পরও যারা দূর্বলতা ও অলসতার কারণে পেছনে থেকে গেছে এবং যুদ্ধে যায়নি তাদের সমালোচনা করা হয়েছে।

০ চতুর্থ অংশে এটি সবচেয়ে দীর্ঘ এবং সূরার অর্ধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে বিস্তৃত। এ অংশে মুনাফিকদের সমালোচনা, ভর্ৎসনা এবং মুসলিম সমাজে তাদের অপতৎপরতার নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে। তাদের মানসিক এবং বাস্তব বিবরণ পেশ ও জিহাদ থেকে তাদের পিছু হটার ছল-ছুঁতো, ওযর-বাহানা এবং দূরভিসন্ধির স্বরূপ উৎঘাটন করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, ভুল বুঝাবুঝি ও কাপুরুষতার বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা এবং রাসূল (সঃ) ও নিষ্ঠাবান মুমিনদের নানাভাবে কষ্ট ও উত্ত্যক্ত করার বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মুনাফিকদের চক্রান্ত থেকে নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। মুসলমান ও মুনাফিকদের মধ্যে সম্পর্ক ছেদ এবং তাদের কার্যকলাপ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

০ সূরার পঞ্চম অংশে মদীনার ইসলামী সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী জনবল আনসার ও মুহাজির ছাড়াও তাদের চারপাশের আরও কিছু দল ও শ্রেণী ছিলো যেমন -বেদুঈনরা। তাদের ভিতর নিষ্ঠাবান মুমিন, মুনাফিক ও দূর্বল মুমিনও ছিলো। অনুরূপ আরও একটি দল এমন ছিলো, যাদের মধ্যে সৎকাজ ও অসৎ কাজের মিশ্রণ ঘটেছিলো এবং যাদের চরিত্রে ইসলামের মজবুত প্রভাব বিদ্যমান ছিলো, তবে ইসলামের প্রতি তাদের তেমন গভীর আকর্ষণ ছিলো না। আরো একটি দল ছিলো, যাদের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানতো না। তাদের পরিনাম কি হবে তা আল্লাহই জানেন। আরো একটি দল ছিলো, যারা ইসলামের নামে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো।

অত্র সূরাতে এসব দল ও শ্রেণী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম সমাজে তাদের সাথে কি ধরণের আচরণ করতে হবে, তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং রাসূল (সঃ) ও একনিষ্ঠ মুসলমানদেরকে এদের সবার সাথে আচরণের কি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, তাও শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। সূরার এই অংশ ৯৭ থেকে ১১০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছে।

www.icsbook.info

০ ষষ্ঠ অংশে আল্লাহর সাথে মুমিনদের ওয়াদা, জিহাদের ধরণ এবং মদীনাবাসী ও তার আশ-পাশের বেদুঈনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আরও বলা হয়েছে, মদীনাবাসীদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, তারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং রাসূল (সঃ) এর জীবন রক্ষার ব্যাপারে উদাসীন থেকে কেবল নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। তাছাড়া মুশরিকদের সাথে মুমিনদের সম্পর্কচ্ছেদের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ অংশে এক পর্যায়ে এমন কয়েকজন মুমিনের যুদ্ধে অনুপস্থিতির ঘটনা ও তার শাস্তির বিধানের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা খাঁটি মুমিন ছিলেন। এই অংশ ১১১ থেকে ১২৭ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছে।

০ সূরার সবশেষে উপসংহারে রাসূল (সঃ) এর গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই অংশ ১২৮ নম্বর আয়াত থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে।

দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতের বিষয়বস্তু ঃ তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু হলো শারীরিক কষ্ট এবং বৈষয়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য যারা তাবুক যুদ্ধে যেতে পিছটান দিচ্ছিলো তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে- পরকালের তুলনায় দুনিয়ার এই সামগ্রী অতি নগণ্য। আর যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথাও বলা হয়েছে। তাছাড়া আরো বলা হয়েছে- আল্লাহর দ্বীনের জন্য যদি এই সংকট মূহুর্তে আল্লাহর নবীকে কেউ সাহায্য না করে তবে তাঁর সাহায্যের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।

এই অংশে আরো বলা হয়েছে যখন যুদ্ধের জন্য সাধারণ ডাক এসে পড়বে, তখন যে অবস্থায় হোক না কেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যারা এ কাজ করবে তাদের পরম সফলতার কথাও বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত দারসের বিষয় অনুধাবনের জন্য দারসের সাথে সম্পর্কিত মূল্যবান কিছু বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। এখন আমি ধারাবাহিকভাবে তিলাওয়াতকৃত

www.icsbook.info

আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি। প্রথমেই মহান আল্লাহ্ বলেন -

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ -

হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হলো যে, তোমাদের যখন বলা হয় (জিহাদের জন্য) আল্লাহর পথে বের হয়ে পড়ো, তখন তোমরা মাটিকে আঁকড়ে ধরো। তবে তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার এসব ভোগ-বিলাসের উপকরণ অতি নগণ্য।

শানে নুযুল ঃ সূরার এখান থেকে তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে অবতীর্ণ ভাষণটি শুরু হচ্ছে। ঘটনা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অনেক দূরের সফর তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার জন্য সাহাবাদেরকে এমন সময় নির্দেশ দেন, যখন একদিকে প্রচন্ড গরম পড়ছিলো, খেজুর গাছের ফল পেকে উঠেছিলো এবং গাছের ছায়া বেড়ে গিয়েছিলো। অপর দিকে রাস্তা ছিলো৷ বন্ধুর, সওয়ারীও ছিলো কম। এসব ওজর দেখিয়ে কিছু লোক যুদ্ধে না যেয়ে রয়ে গিয়েছিলো। তাদেরকেই তিরস্কার করে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এসব শ্রেণীর লোককে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে-যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য ডাক দেয়া হচ্ছে, তখন তোমরা মাটি কামড়িয়ে বসে থাকছো কেন? তোমরা তো দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী ভোগ সামগ্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং কিছু কষ্ট-কাঠিন্যকে বাহানা বানিয়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী নি'য়ামত এবং সুখ-শান্তিকে বিসর্জন দিচ্ছো? তোমরা এটা জেনে রাখো যে, পরকালের ভোগ-বিলাস এবং সুখ শান্তির তুলনায় দুনিয়ার এসব সামগ্রী ও ভোগ-বিলাস মূল্যহীন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) দুনিয়া এবং আখিরাতকে তুলনা করতে যেয়ে তিনি তাঁর তর্জনীর দিকে ইশারা করে বলেন- "কেউ এ আঙ্গুলটি সমুদ্রে ডুবিয়ে উঠালে তাতে যতটুকু পানি উঠবে-এ পানিটুকু সমুদ্রের তুলনায় যেমন, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াও তেমন।" (ইবনে কাসীর)

সুতরাং (তৎকালীন পরাশক্তি রোমান সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে) তাবুক যুদ্ধে

তোমাদেরকে যখন আল্লাহর নবী (সঃ) আল্লাহরই রাস্তায় বের হবার জন্যে ডাক দিচ্ছেন-তখন তোমরা দুনিয়ার মোহে তা থেকে দূরে থাকার জন্যে আখিরাতের পরম পাওনার কথা বেমা'লুম ভুলে গিয়ে দূর এবং দুর্গম পথের বাহানা দেখাচ্ছো। প্রচন্ড গরমের ওজর খায়ের করছো। খেজুর কাটার মৌসুমে পাকা খেজুর ঘরে তুলার লোভ সংবরণ করতে পারছো না, জানবাহনের স্বল্পতার কারণ দেখাচ্ছো। কিন্তু এসবের তুলনায় পরকালীন জীবনে যখন তোমরা সীমাহীন জীবন এবং সেখানকার সীমাহীন সাজ-সরঞ্জাম, ভোগ-বিলাস স্বচক্ষে দেখতে পাবে তখন আফসোস করে কোন লাভ হবে না। দুনিয়ার জীবনের এই দ্রব্য-সামগ্রী পরকালে কোন কাজেই আসবে না। দুনিয়ার এই জীবনে যতো দ্রব্য সামগ্রীই তোমরা সংগ্রহ করে নাও না কেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু থেকেই তোমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পরকালে এর কোন কিছুই যাবে না। যদি তোমরা পরকালে দুনিয়ার কোন প্রতিদান পেতে চাও তবে তাই পাবে, যা তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ-কুরবানী করেছো এবং যেসব জিনিস ও দ্রব্য সামগ্রীকে দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতকে অগ্রাধীকার দিয়েছো।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! যুদ্ধে না যাবার যেসব ওজর বাহানা ও অলসতার কারণ এবং তার প্রতিকারের উপায় এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তা এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, দ্বীনের ব্যাপারে সকল প্রকার আলসামী, নিষ্ক্রীয়তা, ওজর-বাহানা ও সকল প্রকার অপরাধ এবং গোনাহর মূলে রয়েছে দুনিয়া প্রীতি ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা।

হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে, মহানবী (সঃ) বলেন–

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ "দুনিয়ার মোহ সব গোনাহর মূল।"

সেজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ۚ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা মাটিকে

www.icsbook.info

জড়িয়ে ধরো (অর্থাৎ অলসভাবে বসে থাকো) তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেলে।"

মানুষের রোগ নির্ণয়ের পর আয়াতের পরবর্তী অংশে তার প্রতিকার উল্লেখ করে বলা হয়েছে –

فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ

জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ আখিরাতের তুলনায় অতি নগণ্য।

পরবর্তী আয়াতে যুদ্ধে না যাবার প্রতিফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন (অর্থাৎ ধবংস করে দেবেন) এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে পয়দা করবেন, আর তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। জেনে রাখো, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

এখানে আল্লাহ তা'য়ালা জিহাদ বা আন্দোলন–সংগ্রাম থেকে দূরে থাকার দু'টি ভয়াবহ শাস্তির কথা বলেছেন। একটি হলো- আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংশ করে দেবেন। আর দ্বিতীয়টি হলো- অন্য জাতিকে তাদের স্থানে বসিয়ে দেবেন।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে "একটি গোত্রকে আল্লাহর রাসূল (সঃ) জিহাদের জন্যে আহবান করেন। কিন্তু তারা তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি। তখন আল্লাহ শাস্তি হিসেবে তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন।"

একই সূরার ৮১ নম্বর আয়াতে তাদের শাস্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ

يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ط قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ط لَوْكَانُوْا يَفْقَهُوْنَ -

"(তাবুক যুদ্ধে) পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা রাসূল (সঃ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেয়ে তারা আনন্দ লাভ করেছে। পক্ষান্তরে তারা জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ-সংগ্রাম করতে অপছন্দ করেছে এবং (অন্যদেরকে) বলেছে, এই গরমের মধ্যে তোমরা যুদ্ধে বের হয়ো না। (হে রাসূল সঃ) তাদেরকে বলে দিন উত্তাপের দিক থেকে জাহান্নামের আগুনই প্রখর। যদি তাদের (এসব বোঝার) বিবেচনা শক্তি থাকতো!"

অর্থাৎ নবী করীম (সঃ) তাবুকের যুদ্ধে যাবার জন্য যে সাধারণ আহবান জানিয়েছেন, যারা তার এই আহবানে সাড়া না দিয়ে ঘরে বসে থাকবে তাদের আল্লাহ দুনিয়াতে পরাভূত করে ধ্বংস করে দিবেন এবং পরকালে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করবেন।

এখানে জানার বিষয় হলো, এই ডাক ছিলো আম বা সাধারণ ডাক। এই ডাকে সাড়া দেয়া সকলের জন্য ফরয। এই ফরয ত্যাগের ফলে তাদের ঈমানই বিনষ্ট হয়ে যাবে। যার কারণে তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। যদিও তারা সাহাবা ছিলেন। সুতরাং যুগে যুগে যখনই ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য সাধারণ ডাক দেয়া হবে তখন সেই ডাকে সাড়া দেয়া সকলের জন্য অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হয়ে পড়বে।

বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে দ্বীন কায়েম নেয়। সুতরাং দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে পুরুষ-নারী সকলের শরীক থাকা ফরযে আইন-অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য। যদি এই ফরযিয়াত পালন করা না হয়-আর তিনি যতো বড়ই আলিম, পীর-মাসায়েখ হোন না কেন, আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে কেউই রেহায় পাবেন না।

তাবুক যুদ্ধের আহবানে যারা সাড়া দেয়নি, ওজর তালাশ করে পেছনে থেকে গেছেন, তাদেরকে দ্বিতীয় যে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে তা হলো- তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করে দেবেন। অর্থাৎ তোমরা এটা মনে করো না যে, আল্লাহ তোমাদের উপর একান্তভাবে

www.icsbook.info

নির্ভরশীল এবং তোমরাই একমাত্র রাসূল (সঃ) এর সাহায্যকারী। তোমাদের প্রতি আল্লাহর এটা বিশেষ মেহেরবানী যে, আল্লাহ তোমাদেরকে এ মহান কাজের আঞ্জাম দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। তোমরা যদি এই মহাসুযোগ হাত ছাড়া করো, তা হলে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের ধ্বংস করে দিয়ে অন্য কোন এক জাতি বা দলকে তাঁর সঙ্গী-সাথী এবং সাহায্যকারী বানিয়ে দেবেন যারা তোমাদের মতো বাহানা তালাশ করবে না। আর জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহর দ্বীনের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

তোমরা এটা মোটেই মনে করো না যে, তোমরা জিহাদ-সংগ্রাম না করলে অন্য মুজাহিদরা জিহাদ করতেই পারবে না। আল্লাহ তো মহা ক্ষমতাবান, তোমাদের ছাড়াই আল্লাহ অন্য বান্দাহদের দিয়েই শত্রুদের উপর বিজয় দান করবেন। আর তোমরা ব্যর্থকাম হয়ে পড়ে থাকবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট বলে পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন –

إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا۔

যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না করো, তবে আল্লাহই (তার সাহায্য করবেন যেমন তিনি) তাঁর সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিররা তাঁকে বহিস্কার করেছিলো, তখন তিনি ছিলেন দু'জনের একজন। যখন তাঁরা (দু'জন) গুহায় অবস্থান করছিলেন তখন তিনি তাঁর সঙ্গী (আবু বকর রাঃ) কে বলেছিলেন, চিন্তিত হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা জিহাদ হতে দূরে থাকা লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন- তোমরা যদি আমার রাসূল (সঃ)কে সাহায্য সহযোগিতা না করো, তবে জেনে রাখো যে, আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি নিজেই তাঁর সাহায্য এবং পৃষ্টপোষকতা করবো। যেমন সাহায্য এবং পৃষ্টপোষকতা করেছিলাম সেই সময় যখন মক্কার কাফির-মুশরিকরা হিজরতের বছর আমার রাসূল (সঃ) কে হত্যা করা বা বন্দী করা কিম্বা দেশান্তর করার ষড়যন্ত্র করছিলো। তখন নবী (সঃ) তিনি তাঁর বিশ্বস্ত

www.icsbook.info

সহচর ও প্রিয়বন্ধু হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে অতি সংগোপনে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। সে সময় তাঁর সাহায্যকারী কে ছিলো? তিন দিন পর্যন্ত "সাওর" পর্বতের গুহায় তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, তাঁদের পেছনে ধাওয়াকারী কাফিররা তাঁদের না পেয়ে যখন নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে তখন তাঁরা মদীনার পথ ধরবেন। সময় সময় আবু বকর (রাঃ) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন এই ভেবে যে, না জানি কেউ হয়তো জানতে পেরে রাসূল (সঃ)কে কষ্ট দেবে! রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সঙ্গী আবু বকর (রাঃ) কে সান্তনা দিয়ে বললেন,"হে আবু বকর (রাঃ)! দু'জনের কথা চিন্তা করছো কেন? আমাদের সঙ্গে তো তৃতীয় জন আল্লাহ রয়েছেন।"

নবী করীম (সঃ) এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) গুহায় অবস্থান কালে যখন কাফিররা একেবারেই গুহার কাছে পৌছিয়ে গিয়েছিলো তখন আবু বকর (রাঃ) নবী করীম (সঃ) কে বললেন,"এই কাফিররা কেউ যদি পায়ের দিকে তাকায় তাহলেই তো তারা আমাদেরকে দেখে ফেলবে!" তখন তিনি (সঃ) বললেন, "হে আবু বকর! তুমি ঐ দু'জনকে কি মনে করো যাঁদের তৃতীয় জন আল্লাহ রয়েছেন।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

মোট কথা এই স্থানেও আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী রাসূল (সঃ) কে সাহায্য করেছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেন-

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔

অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি গভীর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে সাহায্য করলেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে যা তোমরা দেখতে পাওনি।

আয়াতের এই অংশের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা নিজের পক্ষ থেকে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর উপর সান্তনা ও প্রশান্তি নাযিল করা বুঝানো হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্য তাফসীরকারদের এটাই মত। তাঁদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মধ্যে প্রশান্তিতো ছিলোই। কিন্তু এই বিশেষ অবস্থায় প্রশান্তি নতুন ভাবে নাযিল করার মধ্যেও তো কোন বিপরীত কিছু পাওয়া যায় না। এই জন্যই আল্লাহ পাক একই সাথে বলেন- 'আমি আমার অদৃশ্য

সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছি'। (ইবনে কাসীর) এই অদৃশ্য সৈন্যবাহিনী বলতে ফিরিশতাও হতে পারে আবার দুনিয়ার কোন গোপন শক্তিও হতে পারে। কারণ, এগুলোই হলো আল্লাহর সেনাবাহিনী। (মা'য়ারিফুল কুরআন)

অতঃপর আয়াতের শেষ অংশে মহান আল্লাহ বলেন–

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

এবং কাফিরদের কথাকে নিচু করে দিলেন, আর আল্লাহর কথাতো সর্বোচ্চই এবং আল্লাহ হলেন মহা পরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ তা'য়ালা নবীকে তাঁর সাহায্য এবং সেনা বাহিনী (ফিরিশতাদের) দ্বারা কাফিরদের কালিমা তথা কথাকে দাবিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের কালিমাকে সমুন্নত করেছেন। অর্থাৎ শিরককে নীচু করেছেন এবং তাওহীদ বা আল্লাহর একাত্ববাদকে উপরে উঠিয়েছেন। (ইবনে কাসীর)

"হযরত মুসা আল আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়, হে রাসূল (সঃ)! কেউ বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, আর কেউ যুদ্ধ করে মানুষকে খুশি করতে, আবার কেউ যুদ্ধ করে জাতীয় মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে-এ তিন শ্রেণীর মধ্যে আল্লাহর পথের মুজাহীদ কে? তিনি উত্তরে বললেন, যে লোক আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে সেই হচ্ছে আল্লাহর পথের মুজাহীদ।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাবূক যুদ্ধে বের হবার জন্য পুনরায় তাগিদ দিয়ে বলেন–

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوٰلِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

তোমরা বের হয়ে পড়ো- হালকাভাবে (অর্থাৎ স্বল্প সরঞ্জামের সাথে) কিম্বা ভারাক্রান্ত ভাবে (অর্থাৎ প্রচুর সরঞ্জামের সাথে)। আর তোমরা জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে, এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝো।

خِفَافًا 'হালকা'ও ثِقَالًا 'ভারী' শব্দ দু'টি ব্যাপক অর্থবোধক। এর তাৎপর্য এই যে, যুদ্ধে বের হবার নির্দেশ যখন দেওয়াই হয়েছে, তখন সেজন্য

www.icsbook.info

অবশ্যই বের হতেই হবে-তা স্বেচ্ছায়-আগ্রহের সাথেই হোক কিম্বা অরাজীতে- অসন্তোষের সাথেই হোক। তা স্বচ্ছল অবস্থায়ই হোক কিম্বা চরম অস্বচ্ছল-অভাব অনটনের মধ্যে হোক। প্রচুর সাজ-সরঞ্জামের সাথেই হোক কিম্বা কোন প্রকার সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই হোক। অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যেই হোক কিম্বা মারাত্মক প্রতিকূল অবস্থায় হোক। যুবক ও সবল অবস্থায়ই হোক কিম্বা বৃদ্ধ ও দূর্বল অবস্থায় হোক।

(তাফহীমূল কুরআন)

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) তাঁর পিতা হতে, তিনি আবুয যুহা মুসলিম ইবনে সাবীহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সূরা বারা'আতের (তাওবার) এই আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এতে রয়েছে যে, তাবুক যুদ্ধের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে সকল মুসলমানের যাওয়া উচিত। আহলে কিতাবীদের (ইহুদী-খৃষ্টান) এবং কাফির রোমকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা অবশ্য কর্তব্য। তাতে তাদের মনের ইচ্ছা থাক বা না থাক এবং তাদের কাছে সহজ হোক কিম্বা কঠিনই মনে হোক। তখন বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তিরা বলেছিলো, আমরা এই যুদ্ধে যাত্রা না করলে পাপ হবে না। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

এ আয়াত নাযিলের পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধ ও যুবক সবারই জন্যে এ হুকুম সাধারণ হয়ে গেলো। কারো কোন ওজর আপত্তি চললো না। আবু তালহা (রাঃ) এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন এবং এই নির্দেশ পালনের জন্যে এই বৃদ্ধ সাহাবী সিরিয়ার মাটিতে চলে যান এবং খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আল্লাহর কাছে নিজের জীবন কুরবান করে দেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাকে সন্তুষ্ট রাখুন। (ইবনে কাসীর)

خِفَافًا وَثِقَالًا এর তাফসীরে অনেক তাফসীরকারকগণই এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, এতে যুবক ও বৃদ্ধ অভয় বর্ণিত হয়েছে। মোট কথা এর অর্থ হলো- যুবক হোক কিম্বা বৃদ্ধ হোক, কর্ম থেকে অবসর প্রাপ্ত হোক কিম্বা কর্মের মধ্যে নিয়োজিত থাকুক, ধনী হোক কিম্বা গরীব হোক, ভারী হোক কিম্বা হালকা হোক, অভাবী হোক কিম্বা সাবলম্বী হোক, সুখী হোক কিম্বা দুঃখী হোক, পেশাদার হোক কিম্বা ব্যবসায়ী হোক, শক্তিশালী হোক কিম্বা দূর্বল হোক-যে যেঅবস্থাতেই থাকুক না কেন, কোন ওজর আপত্তি না

করেই প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে এবং জিহাদের জন্য যাত্রা শুরু করে দিতে হবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমরা নিজেরা নিজেদেরকে একজন খাঁটি মুমিন বা মুসলিম দাবী করি। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে দূরে থাকার জন্য কতো ধরনেরইনা ঠুনকো বাহানা, ওজর-আপত্তি পেশ করে থাকি তার কোনো শেষ নেই।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে-"হযরত হাইয়ান ইবনে যায়েদ শারআবী (রহঃ) বলেন, আমি হিমসের শাসনকর্তা সাফওয়ান ইবনে আমরের সাথে জারাজিমা অভিমুখে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। আমি সেখানে দামেস্কের এক অতি বয়স্ক বুযুর্গকে দেখলাম, যিনি আক্রমনকারীদের সাথে নিজের উটের উপর চড়ে আসছেন। তাঁর ভ্রুগুলো চোখের উপর পড়ে রয়েছে। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আমি তাঁর পাশে যেয়ে বললাম, চাচাজান! আল্লাহর কাছেতো আপনার ওজর করার সুযোগ আছে। একথা শুনে তিনি চোখের উপর থেকে ভ্রুগুলো সরিয়ে বললেন, "দেখো মহান আল্লাহ আমাদের হালকা ও ভারী উভয় অবস্থাতেই জিহাদে বের হবার নির্দেশ দিয়েছেন। জেনে রেখো, আল্লাহ তা'য়ালা যাকে ভালবাসেন-তাকে তিনি পরীক্ষাও করে থাকেন। তারপর পরীক্ষায় পাশ করলে তিনি তার উপর রহমত বর্ষণ করেন। দেখো, আল্লাহর পরীক্ষা-তাঁর শুকর, সবর, যিকর এবং খাঁটি তাওহীদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।"

জিহাদের হুকুম দেওয়ার পর আল্লাহর পথে জান-মাল খরচ করার নির্দেশ দিয়ে আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ বলেন-

وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

নিজেদের ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো, এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা বুঝো।

মহান আল্লাহ জিহাদের নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পথে মাল ও জান খরচ করার তাগাদা দিয়ে বলেন যে, এতেই তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ রয়েছে।

www.icsbook.info

দুনিয়ার কল্যাণ ও লাভ হলো- সামান্য কিছু খরচ করে বহু গণীমাতের মাল-সামান লাভ। আর আখিরাতের কল্যাণ ও লাভ হলো-আল্লাহর সন্তুষ্টি ও চিরসুখের মহামূল্যবান স্থায়ী জান্নাত, যার সাথে আর কোন কল্যাণ বা লাভকে তুলনা করা যায় না।

নবী করীম (সঃ) বলেন,"আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পথে জিহাদকারীর জন্যে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, হয় তাকে শহীদ করে জান্নাতে পাঠাবেন, না হয় গাজী করে গনীমাতসহ নিরাপদে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন।"

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

আল্লাহ তা'য়ালা এই সূরার-ই ২০ হতে ২২ নম্বর আয়াতে বলেন-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ لا اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط اِنَّ اللهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

"যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর তারাই হলো সফলকামী। তাদের প্রতিপালক তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন- নিজের দয়া, সন্তুষ্টি এবং এমন জান্নাতের যেখানে আছে তাদের জন্যে স্থায়ী শান্তি। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছেই রয়েছে মহা পুরুস্কার।"

সূরা বাকারার ২১৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

"তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হয়েছে এমতাবস্থায় যে, ওটা তোমাদের কাছে অপছন্দীয়। আর তোমরা কোন কিছু হয়তো অপছন্দ করে থাকো অথচ ওটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে তোমরা হয়তো কোন জিনিস পছন্দ করে থাকো অথচ ওটাই তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আর (কোনটা ক্ষতিকর আর কোনটা কল্যাণকর তা) আল্লাহই ভালো জানেন- তোমরা জানো না।"

www.icsbook.info

আর এজন্যই মনে চাক বা না চাক, পছন্দ হোক বা না হোক ভাল কাজ দ্রুত করা। এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন একজন লোককে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। লোকটি বললো, আমার (ইসলাম গ্রহণ করতে) মন যে চাই না। তখন তিনি তাকে বললেন, মন না চাইলেও তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।"

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! সূরা তাওবার ৩৮ থেকে ৪১ নম্বর আয়াতগুলোর বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে তা হলো –

০ যদিও এ আয়াতগুলো এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছরেরও পূর্বে সাহাবাদের উদ্দেশ্যে নবী করীম (সঃ) এর উপর নাযিল হয়েছিলো। কিন্তু মনে করতে হবে আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাদেরকেই এসব লক্ষ্য করে নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা, কুরআন নবীর উপর নাযিল হয়েছে কিন্তু এর হুকুম কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত কার্যকরী থাকবে।

০ যেহেতু আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত নেই। সুতরাং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদ বা আন্দোলনে নারী পুরুষ সকলেরই জড়িত থাকা ফরজ বা অপরিহার্য কর্তব্য।

০ কঠিন প্রতিকূল অবস্থা এবং জান-মালের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আন্দোলনের নেতার সাধারণ ডাকে সাড়া দিয়ে সকলকেই ঝাঁপিয়ে পড়া। বিভিন্ন ঠুনকো ওজর-বাহানা খাড়া করে নেতার সাধারণ ডাককে পাশ কাটিয়ে অলস ভাবে মাটি কামড়িয়ে ঘরে বসে না থাকা।

০ দুনিয়ার ভোগ সামগ্রীকে আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য মনে করে দুনিয়ার ভোগ্য সামগ্রীর প্রতি সন্তুষ্ট না থেকে আখিরাতের মহা মূল্যবান ভোগ্য সামগ্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। এজন্য দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্ষেত-খামারের ফসলের ক্ষতি এবং চাকুরির ঝুঁকিকে মেনে নিয়ে সকল অবস্থায় দ্বীনি আন্দোলনের জানবাজ কর্মী হিসেবে কাজ করে যাওয়া।

০ যদি আমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ত্যাগ করে বিভিন্ন বাহানা খাড়া করে নিজেকে ভাল মানুষ সেজে জিহাদ-সংগ্রাম থেকে দূরে থাকি, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের মতো এই অকৃতজ্ঞ জাতিকে ধ্বংশ করে অন্য

www.icsbook.info

এক জাতিকে দিয়ে তাঁর দ্বীনের কাজ করাবেন। তাতে আমরা নিজেদেরকে যতই আল্লাহওয়া'লা মনে করিনা কেন। কেননা, আল্লাহর দ্বীন কোন ব্যক্তি বা দল কিম্বা জাতির উপর নির্ভরশীল নয়।

০ হিজরাতের সময় হযরত আবু বক্কর (রাঃ) আল্লাহর নবীকে যেভাবে চতুর কাফির বাহিনীর সশস্ত্র অবস্থান থেকে মদীনায় নিরাপদে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে যদি আমরা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের সাহায্য না করি, তাহলে আল্লাহ্ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন এবং তাঁর অদৃশ্য শক্তি বা বাহিনী দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করে দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কেননা, আল্লাহ্ সব বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন।

০ ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের বিশেষ শিক্ষা হলো, যে কোন প্রতিকূল অবস্থায় হোক না কেন, খোদাদ্রোহী শক্তির চরম হুমকীর মুখেও একমাত্র আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করা। কোন বৈষয়িক শক্তির উপর নির্ভর না করা। কেননা, যতই আল্লাহর উপর নির্ভশীল হওয়া যাবে ততই আল্লাহর সাহায্য এগিয়ে আসবে।

০ যদি আল্লাহর উপর চরম আস্থাশীল হওয়া যায়, তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা খোদাদ্রোহী এবং তাগুতি শক্তির কথা বা দাপটকে ধুলোই মিশিয়ে দেবেন আর আল্লাহর কথা বা বাণীকে উঁচুতে স্থান দেবেন।

০ আল্লাহর দ্বীন যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না, তখন সকলের জন্যই দ্বীনি আন্দোলনে শরীক থাকা ফরজ। তা পুরুষ হোক কিম্বা নারী হোক, যুবক হোক কিম্বা বৃদ্ধ হোক, সুস্থ হোক কিম্বা অসুস্থ হোক, গরীব হোক কিম্বা ধনী হোক, শিক্ষিত হোক কিম্বা অশিক্ষিত হোক, মালিক হোক কিম্বা শ্রমিক হোক, কর্মকর্তা হোক কিম্বা কর্মচারী হোক, আলিম হোক কিম্বা গায়ের আলিম হোক, ফকীর হোক কিম্বা মিসকীন হোক, সাজ-সরঞ্জাম থাক বা না থাক, প্রস্তুতি থাক বা না থাক সকল অবস্থায় যার যার অবস্থান থেকেই জিহাদে অংশ গ্রহণ করা ফরজ। বর্তমান সময়ে,আমাদের সকলের উপর জিহাদ বা আন্দোলন-সংগ্রাম করা ফরজ।

০ নিজেরই সম্পদ এবং জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ বা আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হলে দুনিয়ার জীবনে সুখ শান্তি

www.icsbook.info

পাওয়া যাবে এবং নিরাপদে বসবাস করা যাবে। আর আখিরাতে পাওয়া যাবে চিরস্থায়ী মহা মূল্যবান সুখময় জান্নাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দিদার।

আহ্বান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! আমি আপনাদের খিদমতে যে দারস পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল ত্রুটি কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্যে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। অয়াআখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

পাঠ

অসার ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব, প্রাচুর্য গড়ার কাজে প্রতিযোগিতা না করে বরং স্থায়ী জীবন পরকালে আল্লাহর ক্ষমা, সন্তুষ্টি এবং জান্নাত পাবার প্রতিযোগিতা করা।

সূরা হাদীদ ২০-২৩ আয়াত

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ
بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ
الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ
وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ ؕ
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○ سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ
اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ
يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○ مَآ اَصَابَ مِنْ
مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ
اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ ○ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى
مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ؕ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ○

সরল আনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (২০) তোমরা জেনে রেখো, দুনিয়ার জীবনতো ক্রীড়া-কৌতুক, বাহ্যিক চাকচিক্য, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ,

www.icsbook.info

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওর উদাহরণ এই রকমই যে, এক পশলা বৃষ্টি-যার দ্বারা উৎপাদিত সবুজ শ্যামল শাকসব্জী, গাছপালা দেখে কৃষক হয়ে যায় মহাখুশী। এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি ওটা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়ে যায়। এর বিপরীত হচ্ছে পরকাল-যেখানে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবনতো একটা ধোঁকা ও প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। (২১) তোমরা দৌড়াও এবং একে অপর হতে অগ্রসর হয়ে যেতে চেষ্টা করো তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্যে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহা দয়াশীল। (২২) পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদ বা বিপর্যয় আসে, সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। (২৩) এটা এ জন্যে বলা যে, যা কিছু হারাও বা ক্ষতিগ্রস্থ হও তার জন্যে তোমরা হতাশ হয়ে না পড়ো এবং যা কিছু আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন তার জন্যে উল্লাসে ফেটে না পড়ো। আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اِعْلَمُوْٓا -তোমরা জেনে রেখো। اِنَّمَا - নিশ্চয়ই/প্রকৃতপক্ষে। الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا -দুনিয়ার জীবন। لَعِبٌ -ক্রীড়া/খেল-তামাশা। وَ -এবং। لَهْوٌ -কৌতুক। زِيْنَةٌ -চাকচিক্য। تَفَاخُرٌ - গর্ব-অহংকার। بَيْنَكُمْ -তোমাদের পরস্পরের। تَكَاثُرٌ -অধিক পাওয়া/অধিক অর্জনের। فِى -মধ্যে/ক্ষেত্রে। اَلْاَمْوَالِ - ধন-সম্পদের। اَلْاَوْلَادِ - সন্তান-সন্ততির। كَمَثَلِ -যেমন উদাহরণ। غَيْثٍ - একপশলা বৃষ্টি। اَعْجَبَ -চমতকৃত করে। اَلْكُفَّارَ -কৃষককে। نَبَاتُهٗ - তার উদ্ভিদ সম্ভার। ثُمَّ -এরপর। يَهِيْجُ -শুষ্ক হয়ে যায়। فَتَرٰىهُ - অতঃপর তা তুমি দেখ। مُصْفَرًّا -হরিৎবর্ণ। يَكُوْنُ -হয়ে যায়। حُطَامًا -খড়কুটা। اَلْاٰخِرَةِ -পরকাল। عَذَابٌ -শাস্তি। شَدِيْدٌ - কঠিন/কঠোর। مَغْفِرَةٌ -ক্ষমা। رِضْوَانٌ -সন্তুষ্টি। اِلَّا -ব্যাতীত/ছাড়া। مَتَاعُ - সামগ্রী। اَلْغُرُوْرِ - ধোকা / প্রতারণা। سَابِقُوْٓا - তোমরা

আগেবাড়ো বা অগ্রণী হও। اِلٰى -দিকে। مَغْفِرَةٍ -ক্ষমা। مِنْ رَّبِّكُمْ - তোমার রবের পক্ষ থেকে। جَنَّةٍ -জান্নাত। عَرْضُهَا -উহার প্রশস্ততা। كَعَرْضِ -প্রশস্ততার ন্যায়। السَّمَاءِ -আকাশ সমুহের। وَالْاَرْضِ -এবং পৃথিবীর। اُعِدَّتْ -প্রস্তুত করা হয়েছে। لِلَّذِيْنَ -যারা। اٰمَنُوْا -ঈমান এনেছে। بِاللهِ -আল্লাহর উপর। رُسُلِهٖ -তাঁর রাসূলদের। ذٰلِكَ -ওটা/এটা। فَضْلُ اللهِ - আল্লাহর অনুগ্রহ। يُؤْتِيْهِ -তা দান করেন। مَنْ يَّشَآءُ -যাকে ইচ্ছা। ذُوالْفَضْلِ - অনুগ্রহশীল। الْعَظِيْمِ -বড়/মহান। مَآاَصَابَ -আসেনা। مِنْ -কোন। مُّصِيْبَةٍ -বিপদ-আপদ। فِى الْاَرْضِ -পৃথিবীতে। وَلَا -আর না। اَنْفُسِكُمْ - তোমাদের নিজেদের। فِىْ كِتٰبٍ - কিতাবে আছে। مِنْ قَبْلِ -এর পূর্বেই। نَّبْرَاَهَا -তা আমরা সৃষ্টি করার। عَلَى اللهِ -আল্লাহর উপর/আল্লাহর জন্যে। يَسِيْرٌ -সহজ। لِكَيْلَا -না এটা এজন্যে যে। تَاْسَوْا -তোমরা হতাশ হও। عَلٰى -উপর। مَا -যা। فَاتَكُمْ -তোমরা হারাও। وَلَا -এবং না। تَفْرَحُوْا - তোমরা উল্লসিত হও। بِمَا -ঐ বিষয়ে যা। اٰتٰكُمْ -তোমাদের দান করেন। لَايُحِبُّ -পছন্দ করেন না/ভাল বাসেন না। كُلَّ -প্রত্যেক। مُخْتَالٍ -উদ্ধত। فَخُوْرٍ -অহংকারীকে।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/ বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বরাকাতুহু। আমি আপনাদের সামনে সূরা হাদীদের ২০ থেকে ২৩ নম্বর পর্যন্ত মোট চারটি আয়াত তিলাওয়াত ও তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে সহীহ্ সালামতে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন। 'অমা তাওফীকি ইল্লাহ বিল্লাহ'।

সূরার নামকরণ ঃ অন্যান্য সূরার ন্যায় এই সূরার নামও প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এই সূরার ২৫ নম্বর আয়াতের وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ এই ব্যাকাংশের اَلْحَدِيْدُ শব্দটিকে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। الحديد এর আভিধানিক অর্থ- লোহা। আর রূপক অর্থে- রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা।

নাযিল হবার সময়কাল ঃ সর্বসম্মতি ক্রমে সূরাটি মাদানী। তবে এই সূরাটি কখন নাযিল হয়েছে এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বর্ণনা না থাকলেও সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে মনে হয়, সূরাটি সম্ভবতঃ ওহুদ যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মাঝামাঝি কোন এক সময়ে অবতীর্ণ হয়। কেননা, এই সময়ই মদীনা কেন্দ্রীক ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রটিকে কাফিররা সব দিক দিয়ে আয়ত্ত্বে নিয়ে নিয়েছিলো। আর অত্যন্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থার মধ্য দিয়ে মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোকদের দল সমগ্র আরব শক্তির মোকাবেলা করতেছিলো। এই সময় নবীর অনুসারীদের ইসলামের জন্য কেবল জানের কুরবানীই জরুরী ছিলো না বরং তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন ছিলো আর্থিক কুরবানীর।

এই সূরাতে অর্থ দানের জন্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাবে আবেদন জানানো হয়েছে। ১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা ঈমানদার লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, "মক্কা বিজয়ের পর যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করবে ও আল্লাহর পথে লড়াই করবে, তারা সেই লোকদের সমমর্যাদার অধিকারী কখনও হতে পারে না, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে জান ও মালের কূরবানী করবে।"

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইবনে মারদুইয়া হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি কুরআনের এই আয়াত

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

(ঈমানদার লোকদের জন্য এখনও কি সেই সময় আসে নাই যে, তাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে বিগলিত হবে এবং তারা সত্যের সামনে মাথানত করবে) সম্পর্কে বলেছেন যে, কুরআন নাযিল হবার সূচনা থেকে ১৭ বছর পরে ঈমানদার লোকদেরকে কাঁপিয়ে তুলবার জন্য এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এ হিসেবে আলোচ্য সূরাটি নাযিল হবার সময়কাল ৪র্থ ও ৫ম হিজরীর মধ্যবর্তী সময় বলে ধরে নেয়া যায়। (আল্লাহই ভাল জানেন)

সূরাটির মূল বিষয়বস্তু ঃ সূরাটির মূল বিষয়বস্তু হলো আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের আহবান। এই সূরাটি এমন এক সময় অবতীর্ণ হয় যখন মুসলমানদের চরম সংকটকাল অতিবাহিত হচ্ছিল। গোটা আরব বিশ্বের

কাফিররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলো। জাহিলিয়াতের সাথে ইসলামের চূড়ান্ত ফয়সালা দানকারী যুদ্ধ চলছিলো। এই অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের উপদেশ দেন- বিশেষভাবে মুসলিম নাগরিকদের আর্থিক কুরবানীতে উদ্বুদ্ধ করেন। সেই সংগে এই কথাটিও তাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেন যে, কেবলমাত্র মৌখিক স্বীকৃতি আর কতিপয় বাহ্যিক আ'মলই ঈমান নয়। বরং আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে অকপট, অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ হওয়াই হলো প্রকৃত ঈমান। যে ব্যক্তি এই প্রাণ উৎসর্গকারী মূল ভাবধারার সাথে পরিচিত নয়, যাদের অন্তর এই ভাবধারা থেকে শূন্য এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের মোকাবেলায় জান-মাল ও স্বার্থটাকেই বেশী প্রিয় ও অধীক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, তার ঈমানের স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার একেবারেই অন্তঃসার শূন্য। আল্লাহর নিকট এই অন্তঃসার শূন্য ঈমানের একবিন্দুও মূল্য নেই।

দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর মূল বিষয়বস্তু ঃ

দুনিয়ার জীবনের ক্রীড়া-কৌতুক, ভোগ-বিলাস, চাকচিক্য, গর্ব-অহংকার, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা চাকচিক্যময় ফল-ফসলের খড়কুটার ন্যায় অন্তঃসার শূন্য। আবার আখিরাতের জীবন, যা স্থায়ী-যেখানে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনতো হলো ধোকা ও প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জন্য সকলকে দৌড়াতে হবে, প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে জান্নাতের পথে, যেখানে আছে চিরস্থায়ী শান্তি এবং আল্লাহর দিদার ও সন্তুষ্টি।

আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত ছাড়া কোন বিপদ আপদ আসে না। এই জন্য কোন কিছু ক্ষতি হলে কিম্বা-কোন কিছু হতে মাহরূম হলে তার জন্য হাহুতাশ করা যাবে না। আবার বেশী কিছু পাওয়ার ফলে উল্লাসে ফেটে পড়াও যাবে না।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে দারসের জন্য প্রাথমিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হলো, যা কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।

অতঃপর আপনাদের সামনে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা ধারাবাহিকভাবে পেশ করছি। দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

www.icsbook.info

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ط

তোমরা জেনে রেখো যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, বাহ্যিক চাকচিক্য, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সূরা হাদীদের ২০ নং আয়াতের প্রথমাংশে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, দুনিয়ার এই জীবন মূলতঃ এক ক্ষণস্থায়ী জীবন। এখানকার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত সব কালই অস্থায়ী। আর দুনিয়ার মন ভুলানো সামগ্রীর কোন অভাব নেই। কিন্তু সবকিছুই অতি নগণ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ। অথচ মানুষ এই মন ভুলানো ক্ষণস্থায়ী অতি নগণ্য এবং তুচ্ছ জিনিসের জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে, গর্ব-অহংকার করে। এটা মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই এগুলোকে খুব একটা বড় এবং বিরাট কিছু মনে করে থাকে।

দুনিয়ার চাকচিক্যময় বস্তু-সামগ্রী সম্পর্কে বলতে গিয়ে সূরা আলে ঈমরানের ১৪ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

"মানুষের জন্য চাকচিক্য ও আকর্ষণীয় করা হয়েছে- নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত ঘোড়া, গৃহপালিত পশু এবং খেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী। এ সবই হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রী। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয় স্থল।"

দুনিয়ার জীবনে এই চাকচিক্যময় বস্তুসামগ্রী এবং জীবনের উদাহরণ বর্ণনা করে মহান আল্লাহ আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেন–

كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ط وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

ওর উদাহরণ হলো এরকমই যে, এক পশলা বৃষ্টি যার দ্বারা উৎপাদিত সবুজ শাকসব্জী, গাছপালা দেখে কৃষক হয়ে যায় মহা খুশী। এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি ওটা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড় কুটায় পরিণত হয়ে যায়। এর বিপরীত হলো পরকাল। যেখানে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবনতো ধোকা ও প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।

আয়াতের এই অংশে পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে যে, এর শ্যামল-সজীবতা ধ্বংসশীল, এখানকার নি'য়ামতরাজীও ক্ষণস্থায়ী। অনুরূপ উদাহরণ পেশ করা হয়েছে সূরা কাহাফ এর ৪৫ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا-

"(হে নবী সঃ!) তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। অতঃপর তার দ্বারা ভূমি থেকে সবুজ-শ্যামল শাকসব্জী লতাপাতা উৎপন্ন হয়, অতঃপর তা এমন ভাবে শুকিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় যে, তা বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ্ এসব কিছুর উপর শক্তিমান।"

غَيْثٍ বলা হয় ঐ বৃষ্টিকে যা মানুষের হতাশার পর বর্ষিত হয়। যেমন আল্লাহ্ অন্য জায়গায় বলেন–

وَهُوَالَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا

"তিনিই সেই আল্লাহ যিনি মানুষের প্রতাশার পর বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন।"

সুতরাং বৃষ্টির কারণে যেমন যমীনে ফসল উৎপন্ন হয়, ক্ষেতের ফসল দুলতে থাকে আর চাষীদের মনকে উৎফুল্ল করে দেয়, তেমনিভাবে দুনিয়ায় মানুষ দুনিয়ার ধন-মাল, পণ্য-দ্রব্য এবং মূল্যবান সামগ্রী লাভ করে গর্ব-অহংকারে ফুলে-ফেঁপে উঠে। কিন্তু পরিনাম এই দাঁড়ায় যে, যেমন ক্ষেতের ঐ চোখ জুড়ানো সবুজ শ্যামল ফসল শুকিয়ে শেষ পর্যন্ত খড়কুটায় পরিণত হয়ে যায়। ঠিক অনুরূপ দুনিয়ার এই চাকচিক্যময় ভোগ্যসামগ্রী সবই একদিন মাটির সাথে মিশে যাবে। দুনিয়ার জীবনও তাই প্রথমে আসে যৌবন,

এরপরে অর্ধবয়স এবং শেষে বার্ধক্যে পৌঁছে যায়। স্বয়ং মানুষের অবস্থায়ও ঠিক অনুরূপ। তার শিশুকাল, তার কিশোর কাল, তার যৌবন কাল, তার পৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য। এসব অবস্থার কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়! কোথায় সেই যৌবনের রক্তের গরম এবং শক্তির দাপট। আর কোথায় বার্ধক্যের দূর্বলতা, কোমরের ব্যথা ও হাড়-হাড্ডীর শক্তিহীনতা! যেমন মহান আল্লাহ সূরা রূমের ৫৪ নম্বর আয়াতে বলেন–

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ-

"আল্লাহ তিনিই যিনি তোমাদেরকে দূর্বলতার অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, তারপর ঐ দূর্বলতার পরে শক্তি দান করেছেন, আবার ঐ শক্তির পরে দিয়েছেন দূর্বলতা ও বার্ধ্যক্য, তিনি যা চান সৃষ্টি করে থাকেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও ক্ষমতাবান।"

এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব ও নশ্বরতার বর্ণনা দিয়েছেন।

এবার আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতের শেষ অংশে আখিরাতের দু'টি দৃশ্য প্রদর্শন করে একটি হতে ভয় দেখাচ্ছেন আর অপরটির প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন।

দুনিয়ার জীবনের সবকিছুই তুচ্ছ, নগণ্য এবং ক্ষণস্থায়ী। সবকিছুই নিমিষের মধ্যেই হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু পরকালের জীবন বিরাট, বিশাল, মহান ও চিরস্থায়ী জীবন। সেখানকার স্বার্থ, সুখ-সুবিধা সবই যেমন বিরাট, বিশাল ও স্থায়ী, তেমনি সেখানকার ক্ষতিও মারাত্মক এবং স্থায়ী। সুতরাং পরকালের আযাব বা শাস্তি যেমন ভয়াবহ, তেমনি আখিরাতে আল্লাহর ক্ষমা, সন্তুষ্টি এবং সুখ-শান্তিও অনাবীল ও চিরস্থায়ী।

দুনিয়ার জীবন একটা প্রতারণা ও ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যে বা যারাই দুনিয়ার এই মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তারাই আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের প্রাধান্য দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, আখিরাতকে ভুলেই বসে। এমনকি অস্বীকার পর্যন্ত করে বসে।

পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়ার জীবনের প্রতিযোগিতা না করে বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত পাবার প্রতিযোগিতার তাগাদা দিয়ে বলেন –

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۭ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

তোমরা দৌড়াও এবং একে অপর থেকে বেড়ে যাবার চেষ্টা করো তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর সমান-যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহা অনুগ্রহশীল।

এখানে তীব্র প্রতিযোগিতার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পরস্পর তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একজনকে ছাড়িয়ে অপরজনের এগিয়ে যাবার কথা বুঝানো হয়েছে।

এখানে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন যে, তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও স্বাদ-আস্বাদের সামগ্রী সংগ্রহ করার কাজে যে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছো, একে অপরকে ছাড়িয়ে নিজে সবার আগে চলে যেতে ও অন্যের তুলনায় খুব বেশী বেশী পাবার জন্যে যে অবিরাম চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাচ্ছো, তা ছেড়ে দাও। বরং তার পরিবর্তে আল্লাহর বেশী বেশী ক্ষমা, সন্তুষ্টি এবং আসমান যমীন বরাবর জান্নাত পাবার আশায় দৌড়াও- প্রতিযোগিতা করো। সেই দিকে একে অপরকে ছেড়ে বেড়ে যাবার প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করো। দিন-রাত সেই চেষ্ঠা চরিত্রেই লেগে থাকো। যেমন আল্লাহর নবী (সঃ)-এর সঙ্গী-সাথীরা ভাল ভাল এবং নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা করতেন।

বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে- একবার মুহাজির (হিজরতকারী) লোকদের মধ্য থেকে গরীব লোকেরা আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ধনী লোকেরাতো জান্নাতের উচ্চ শ্রেণী ও চিরস্থায়ী নি'য়ামতের অধিকারী হয়ে গেলো। নবীজী (সঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ এটা আবার কিভাবে ? উত্তরে তারা

www.icsbook.info

বললো, নামায- রোযা তো তারা ও আমরা সবাই করি। কিন্তু ধন-সম্পদের কারণে তারা বেশী বেশী দান-খয়রাত ও গোলাম আযাদ করে থাকে। কিন্তু আমরা গরীব হবার কারণে একাজগুলো করতে পারিনা। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বললেন, এসো, আমি তোমাদেরকে এমন একটি আ'মলের কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, যদি তোমরা তা করো তাহলে তোমরা সবারই আগে বেড়ে যাবে। তবে তাদের উপর তোমরা প্রাধান্য লাভ করতে পারবে না যারা নিজেরাও এ আ'মল করতে শুরু করে দেবে। তা হলো এই যে, তোমরা প্রত্যেক ফরয নামাযের পর- ৩৩ বার "সুবহান আল্লাহ" ৩৩ বার "আলহামদুলিল্লাহ" এবং ৩৩ বার "আল্লাহু আকবার" পাঠ করবে। কিছু দিন পর ঐ মহান ব্যক্তিরা পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের এই অযীফার খবর আমাদের ধনী ভাইয়েরাও পেয়ে গেছে এবং তারাও এটা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। (ইবনে কাসীর)

এজন্যই আল্লাহর অনুগ্রহ, ক্ষমা এবং জান্নাত পাবার আশায় দুনিয়াতে বেশী বেশী ভাল ভাল নেক আ'মল করা। এই কাজেরই প্রতিযোগিতা করা, একে অপরের চেয়ে আগে বেড়ে যাবার জন্য তীব্র ইচ্ছা-আকাংখা পোষণ করা এবং সেই অনুযায়ী আ'মল করা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা এর উল্টোটায় করে থাকি। যেমন 'সূরা তাকাছুরে' এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ٥ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ "দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য লাভের লোভ-লালসা তোমাদেরকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, তোমরা কবরে পৌছে যাও।"(অর্থাৎ মৃত্যু এসে হাযির হয়ে যায়)

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়ার বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন-

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِىٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

পৃথিবীতে কিম্বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে, সংঘঠিত হবার পূর্বেই তা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষে এটা করা খুবই সহজ।

এখানে আল্লাহ্ তা'য়ালা যে নিজে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী তার সংবাদ দিচ্ছেন। তিনি মাখলুকাতকে তথা সৃষ্টি জীবকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাঁদের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। এখানে 'কিতাব' বলে ভাগ্যলিপিকে বুঝানো হয়েছে। তিনি বলেন, পৃথিবীর বুকে যে কোন অংশে বা স্থানে যে বিপর্যয় আসে কিম্বা ব্যক্তিগতভাবে কারো উপর কোন বিপদ আসে, তার এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, ওটাই তার জন্য ভাগ্যে বরাদ্ধ ছিলো। কেননা; মাখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে, "আল্লাহ্ তা'য়ালা যমীন ও আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তকদীর নির্ধারণ করেন।"

বিপর্যয় সংক্রান্ত এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম হাসান (রাঃ) কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, "সুবহান আল্লাহ! প্রত্যেক বিপদ ও বিপর্যয় যা আসমান ও যমীনে সংঘটিত হয়,তা সৃষ্টিজীবের সৃষ্টির বহু পূর্বেই মহান প্রতিপালকের কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অতএব এতে সন্দেহের কি আছে?"

যমীনের বিপর্যয় হলো- অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, টর্নেডো, জলোচ্ছাস, সুনামী, দুর্ভীক্ষ, মহামারী, ভুমিকম্প ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয় হলো- অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যধি ইত্যাদি।

আয়াতের শেষাংসে মহান আল্লাহ্ বলেন-

إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ - **নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষে এটা করা খুবই সহজ।**

অর্থাৎ কাজে পরিণত হবার পূর্বে এটা জেনে নেয়া, এটা হবার জ্ঞান লাভ করা এবং এটাকে লিখে দেয়া আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে মোটেই কঠিন নয়। তিনিইতো এসবের সৃষ্টিকর্তা। যা কিছু হয়ে গেছে এবং যা কিছু হবে, সব কিছুই তাঁর সীমাহীন জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর দারসের তিলাওয়াতকৃত সব শেষ আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন-

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ-

এটা এইজন্য যে, যা কিছু হারাও বা ক্ষতিগ্রস্থ হও তার জন্য তোমরা হতাশ হয়ে না পড়ো এবং যা কিছু তোমাদের আল্লাহ দিয়েছেন তার জন্য উল্লাসে ফেটে না পড়ো। আল্লাহ্ কোন উদ্বত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

www.icsbook.info

এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, এ খবর আমি তোমাদেরকে এজন্যই দিলাম যে, তোমাদের উপর যে বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত অথবা সুখ-শান্তি, আনন্দ যা কিছুই আসুক না কেন তা সবই কিতাবে তথা ভাগ্যলিপিতে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রাখা হয়েছে। এটা টলাবার বা নড়চড় করার কোনই সুযোগ নেই এই বিশ্বাস যেন তোমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল থাকে। কঠিন বিপদ-আপদের সময়ও যেন তোমাদের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, স্থীরতা এবং রূহানী শক্তি বিদ্যমান থাকে। তোমরা যেন এর জন্য হা-হুতাশ না করো এবং অধৈর্য হয়ে না পড়ো। তোমাদের মনে যেন এটাই বিদ্যমান থাকে যে, এ বিপদ আসারই ছিলো। অনুরূপভাবে যদি তোমরা ধন-সম্পদের অযাচিত ভাবে মালিক হয়ে যাও অথবা বিজয় লাভ করো তা হলে গর্ব-অহংকারে যেন তোমরা ফেটে না পড়ো। এমন যেন না হয় যে, ধন-সম্পদ এবং সুখ-শান্তি লাভের কারণে আল্লাহকে ভুলে বসো। আল্লাহর স্বরণ এবং পরকাল সম্পর্কে গাফিল বা অমনোযোগী হয়ে না যাও।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোনো কোনো বিষয়ের কারণে আনন্দিত হয় এবং কোনো কোনো বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে ধৈর্য ধারণ করে আখিরাতের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করা এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করা। (রুহুল মা'য়ানী)

আয়াতের শেষাংসে সুখ-শান্তি ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য এবং বিজয়ের কারণে উদ্ধত ও অহংকারকারীদের নিন্দা করে বলা হয়েছে-

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ-

আর আল্লাহ তা'য়ালা কোন উদ্ধত গর্ব-অহংকারকারীকে পছন্দ করেন না।

অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা আল্লাহর নি'য়ামত, সুখ-শান্তি ও বিজয় লাভ করে অহংকার করে, তারা আল্লাহর কাছে ঘৃণার পাত্র। আল্লাহ এদেরকে মোটেই পছন্দ করেন না।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে উদ্ধত অহংকারী হতে বাঁচিয়ে সর্বক্ষেত্রে সকল অবস্থায় তোমরাই কৃতজ্ঞ ও অনুগত বান্দাহ বানিয়ে দাও।আমীন!

www.icsbook.info

শিক্ষাঃ সূরা হাদীদের ২০ থেকে ২৩ নম্বর আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেসব শিক্ষনীয় বিষয় পাওয়া যায়, তা হলো –

o দুনিয়ার জীবনের ক্রীড়া-কৌতুক, খেল-তামাশা, চাকচিক্য, সাজ-গোজ, গর্ব-অহংকার, অর্থ-সম্পদ, ছেলে-মেয়ে, ঐশ্বর্য-বৈভব এসব কিছুই একটা অসার প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং আমাদের উচিত হবে এসব অসার, ক্ষণস্থায়ী প্রতিযোগিতায় নেমে না পড়া এবং এসব প্রাচুর্যের কারণে গর্ববোধ না করা। বরং দুনিয়ার জীবনের পরবর্তী দু'টি জগত বরযখ বা কবরের জীবন এবং স্থায়ী জীবন আখিরাতের চিন্তা করা। কেননা, আখিরাতের জিবনই হলো আসল এবং স্থায়ী জীবন।

o দুনিয়ার জীবনটা এরকমই অসার, সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী যার উদাহরণ এমন-দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর এক পশলা বৃষ্টির কারণে মাঠে চোখ জুড়ানো সবুজ-শ্যামল ফসল, শাক-সবুজী, গাছ-পালা উৎপন্ন হয়, যা দেখে চাষীদের আনন্দে বুক ভরে যায়। কিন্তু পরিশেষে তা শুকিয়ে পীতবর্ণ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তা খড়-কুটোই পরিণত হয়ে যায়। অনুরূপ মানুষের জীবনও তাই, প্রথমে তরু-তাজা ও সুন্দর-শুশ্রী হয়। শিশুকাল থেকে যৌবন কাল পর্যন্ত এরকমই চলে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে যায় এবং পরিশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। অর্থাৎ সবুজ-শ্যামল ফসল যেমন শেষ পর্যন্ত মরে খড়-কুটোয় পরিণত হয়। তেমনি যৌবনের রূপ-সৌন্দর্যে ভরা মানুষের দেহও এক সময় মরে মাটি হয়ে যায়।

o দুনিয়ার অসার ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিপরীত হলো, চিরস্থায়ী জীবন পরকাল। যেখানে আছে পাপী দুনিয়াদারদের জন্য কঠিন শাস্তি। আর আছে নেককার মুমিনদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা, সন্তুষ্টি ও ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে চোখ জুড়ানো ও মন ভুলানো দুনিয়ার চাকচিক্য ধোঁকা ও প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং মানুষের উচিত হবে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালীন জীবনের বেশী বেশী চিন্তা ফিকির করা।

o দুনিয়ার অসার ও ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ, বাড়ি-গাড়ি গড়ার কাজে প্রতিযোগিতায় আত্মনিয়োগ না করে বরং পরকালীন সুখ-শান্তি এবং

www.icsbook.info

দুনিয়া বরাবর জান্নাত পাবার আসায় পরস্পর প্রতিযোগিতায় আত্মনিয়োগ করা। নেক ও সৎ কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করা। সৎ কাজে একে অপরের চেয়ে বেড়ে যাবার চেষ্টা করা। যেমন- হযরত আলী (রাঃ) তাঁর উপদেশ বাণীতে বলেন- "তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম আগমনকারী এবং সর্বশেষ নির্গমনকারী হও"। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, "জিহাদে সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্য অগ্রসর হও"। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, "জামায়াতে নামাযে প্রথম তাকবীরে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করো"। এভাবে যতো নেক, ভাল ও সৎ কাজ আছে তাতে একে অপরের চেয়ে বেশী অগ্রসর হবার প্রতিযোগিতা করা একজন খাঁটি মুমিনের কাজ। কেননা, আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাসী, সৎ ও নেক আ'মলের প্রতিযোগিদের জন্যেই এই নি'য়ামতে পরিপূর্ণ বিশাল জান্নাত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, যা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও দান।

০ দুনিয়াতে এবং ব্যক্তিগতভাবে যেসব বিপর্যয় ও বিপদ-আপদ আসে তা হঠাৎ করে আসে না, তা সংঘটিত হবার বহু পুর্বেই ভাগ্যলিপিতে লিখা আছে। মানুষ যদি এই ভাগ্যলিপির বিষয়ে পূর্ণ ঈমান রাখে। তাহলেই বিপদ আপদের সময় বিচলিত হয়ে পড়বে না। যারা বিচলিত হয়ে পড়ে তারা প্রকৃতপক্ষে মুমিন নয়।

০ দুনিয়ার জীবনে যদি কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয় কিম্বা কোন বিপদ-আপদ এসে পড়ে তাহলে তার জন্য যেমন হা-হুতাশ করা যাবে না, তেমনি সুখ-শান্তি ও বিজয়ের জন্য অতি আনন্দে উল্লোসিত হয়ে গর্ব অহংকার করাও যাবে না। কেননা, মুমিনদের এটা বৈশিষ্ট্য নয়। বরং মুমিনদের জন্য করণীয় হবে যখন দুনিয়ায় বিপর্যয় দেখবে কিম্বা ব্যক্তিগত জীবনে বিপদ-আপদে পড়বে তখন ধৈর্য ধারণ করবে এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। আর যখন সুখ-শান্তি আসবে কিম্বা কোন বিজয় হবে তখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে এবং নিজের ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। সুখ-শান্তি, আনন্দ ও বিজয়ের জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে আত্মতৃপ্তি বোধ করাই হলো গর্ব-অহংকার। আর আল্লাহ গর্ব-অহংকারকারীদেরকে মোটেই ভালবাসেন না।

www.icsbook.info

আহ্বানঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা হাদীদের ২০ থেকে ২৩ নম্বর আয়াতের দারস পেশ করা হলো, এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ত্রুটি কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। অয়াআখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

www.icsbook.info

মানুষের কতিপয় নৈতিক দোষ-ত্রুটি ও তার পরিণতি

সূরা - হুমাযাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ۝ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝
يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝
وَمَا اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝ الَّتِيْ تَطَّلِعُ
عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১) এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিশ্চিত ধ্বংস, যে সামনাসামনি লোকদের নিন্দা করে এবং অসাক্ষাতে দোষ-ত্রুটি প্রচার করে বেড়ায়। (২) আর যে অর্থ-সম্পদ জমা করে ও গুনে গুনে রাখে। (৩) সে মনে করে যে, তার এ অর্থ-সম্পদ তাকে অমর (চিরজীবী) করে রাখবে। (৪) কক্ষণও নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। (৫) (হে নবী) আপনি কি জানেন, হুতামাহ কি? (৬) এটা হলো আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন, (৭) যা দিল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। (৮) নিশ্চয় তা তাদের উপর ঢেকে বন্ধ করে দেয়া হবে (৯) এবং উঁচু উঁচু খুঁটি বা স্তম্ভে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَيْلٌ-ধ্বংস। لِكُلِّ-প্রত্যেকের জন্যে। هُمَزَةٍ- সামনাসমনি নিন্দাকারী। لُمَزَةٍ-অসাক্ষাতে দোষ-ত্রুটি প্রচারকারী। اَلَّذِيْ -যে বা যিনি। جَمَعَ -জমা করেছে। مَالًا-অর্থ-সম্পদ। وَعَدَّدَهٗ -এবং তা গুনে গুনে রাখে। يَحْسَبُ -সে মনে করে। اَنَّ -যে। مَالَهٗ- তার অর্থ-সম্পদ। اَخْلَدَهٗ -তাকে অমর বা চিরজীবী করে রাখবে। كَلَّا -

www.icsbook.info

কক্ষণও নয়। لَيُنْبَذَنَّ -সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে। فِي -মধ্যে। الْحُطَمَةِ -চূর্ণ-বিচূর্ণকারী (জাহান্নামের একটি স্তরের নাম)। مَا -কি। أَدْرَاكَ -আপনি জানেন। مَاالْحُطَمَةُ -চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থান কি? نَارُاللهِ -আল্লাহর আগুন। الْمُوْقَدَةُ -প্রজ্জলিত বা উত্তপ্ত-উৎক্ষিপ্ত। الَّتِي -যা। تَطَّلِعُ -পৌছে যাবে। عَلَى -উপর। الْأَفْئِدَةِ -অন্তরসমূহে। إِنَّهَا -নিশ্চয়ই তা। عَلَيْهِمْ -তাদের উপর। مُؤْصَدَةٌ -ঢেকে দেয়া হবে। عَمَدٍ -স্তম্ভ বা খুঁটিসমূহ। مُمَدَّدَةٍ -উঁচু উঁচু বা লম্বা লম্বা।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা ও বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য পবিত্র কুরআনের আম্মাপারার ছোট্ট সূরাসমূহের মধ্য থেকে একটি সূরা 'সূরা হুমাযাহ' তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লাবিল্লাহ।"

সূরার নামকরণ ঃ অন্যান্য সূরার ন্যায় এই সূরাটিরও নামকরণ করা হয়েছে প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে। সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত همزه শব্দ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। همزة -শব্দের অর্থ সামনাসামনি নিন্দা করা বা ধিক্কার দেয়া।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ সমস্ত তাফসীরকারকগণই এ ব্যাপারে একমত যে, সূরাটি মাক্কী। তাছাড়া এর বিষয়বস্তু ও বাচনভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করলে প্রতিয়মান হয় যে, এই সূরাটিও নবী করীম (সঃ) এর মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ।

সূরাটির বিষয়বস্তু ঃ ইসলাম পূর্বযুগে জাহিলিয়াতের যামানায় আরব সমাজের অর্থলিপ্সু বা অর্থপূজারী ধনী লোকদের মধ্যে কতগুলো মারাত্মক ধরনের নৈতিক ত্রুটি ও দোষ বিদ্যমান ছিলো। এই সূরায় তারই বিভৎসতা উল্লেখ করে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের নৈতিক ত্রুটি ও দোষের প্রথমটি ছিলো, তারা মানুষকে সামনাসামনি গালমন্দ করতো, বিদ্রুপ করতো এবং ধিক্কার দিয়ে অপমান অপদস্ত করতো। তাদের দ্বিতীয় নৈতিক ত্রুটি ও দোষ ছিলো, তারা অসাক্ষাতে বা পেছনে মানুষের বদনাম করতো, নিন্দা-মন্দ করতো এবং গীবত করতো। তৃতীয় যে নৈতিক দোষ বা ত্রুটি

www.icsbook.info

ছিলো, তা হলো- তারা ছিলো অত্যন্ত অর্থলিপ্সু বা অর্থপূজারী। তারা যেভাবেই হোক অর্থ উপার্জন করতো, জমা করে রাখতো এবং তা বার বার গুনে গুনে দেখতো। তারা মনে করতো যে, এই অর্থ-সম্পদই তাদেরকে অমর বা চিরস্থায়ী করে রাখবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের এই নৈতিক ক্রটি ও দোষের প্রতিবাদ করেছেন এবং তাদের কঠিন পরিণতির কথাও এই সূরায় উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যাঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে 'সূরা হুমাযাহ' এর সরল অনুবাদসহ ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য পেশ করলাম যা দারস বুঝার জন্য সহায়ক হবে। এখন আমি আপনাদের সামনে 'সূরা হুমাযাহ' এর ব্যাখ্যা ধারাবাহিকভাবে পেশ করছি।

সূরার শুরুতেই মানুষের নৈতিক দোষ-ক্রটি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

চরম দুর্ভোগ যা ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে সামনাসামনি মানুষকে ধিক্কার দেয় কিম্বা গালমন্দ করে আর অসাক্ষাতে বা পেছনে দোষ-ক্রটি প্রচার করে বেড়ায়।

وَيْلٌ -মানে ধ্বংস। এই ধ্বংশ বলতে পরকালের ধ্বংস বা বিপর্যয় কিম্বা দূর্ভোগের কথাই বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পরকালের তুলনায় দুনিয়ার ধ্বংশ বা বিপর্যয় কোন ধ্বংশ কিম্বা বিপর্যয় নয়। সুতরাং এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আখিরাতের বিপর্যয় যাদের মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত মারাত্মক ধরনের নৈতিক ক্রটি ও দোষ বিদ্যমান থাকবে। তার মধ্যে প্রথম দু'টি দোষ বা ক্রটি হলো- هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

যারা সামনাসামনি গাল মন্দ করে কিম্বা ধিক্কার দেয় আর অসাক্ষাতে বা পেছনে পরনিন্দা বা গীবত করে বেড়ায়।

আরবী 'হুমাযাহ' 'লুমাযাহ' শব্দ দু'টি অর্থের দিক দিয়ে প্রায় সমর্থবোধক। অর্থের দিক দিয়ে শব্দ দু'টি এতই কাছাকাছি যে, কখনও কখনও শব্দ দু'টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনও কখনও শব্দ দু'টির মধ্যে পার্থক্য করা হয়। কিন্তু সেই পার্থক্যও এমন যে, স্বয়ং আরবী ভাষা-ভাষীরা 'হুমাযাহ' এর যে অর্থ বলেন, অন্য কিছু লোক ঠিক সেই অর্থই

বলেন 'লুমাযাহ' শব্দের। পক্ষান্তরে 'লুমাযাহ' এর যে অর্থ করেন, অন্য লোকের মতে উহাই হলো 'হুমাযাহ' এর অর্থ। এইজন্য তাফসীরকারকদের মধ্যেও 'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ' এর অর্থের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) هُمَزَةٍ শব্দের অর্থ করেছেন সামনাসামনি খোটা দানকারী এবং لمزة শব্দের অর্থ করেছেন পেছনে গীবত কারী।

হযরত রবী ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন, সামনে মন্দ বলাকে هُمَزَةٍ বলা হয় এবং অসাক্ষাতে নিন্দা করাকে لُمَزَةٍ বলা হয়।

হযরত কাতাদাহ (রহঃ) বলেন,এর ভাবার্থ হলো- মুখের ভাষায় এবং চোখের ইশারায় আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়া।

মুজাহীদ (রহঃ) বলেন, هُمَزَةٍ এর অর্থ হলো-হাত এবং চোখ দ্বারা কষ্ট দেয়া এবং لُمَزَةٍ এর অর্থ হলো মুখ বা জিহ্বা দ্বারা কষ্ট দেয়া।

(ইবনে কাসীর)

সূরার প্রথমেই মানুষের নৈতিক ত্রুটি এবং বদ অভ্যাসের এই শব্দ দু'টি একসঙ্গে একই স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে উভয়ের মিলিতভাবে এই অর্থ প্রকাশ করে যে, যে ব্যক্তির অভ্যাসই হলো অন্য লোকদের ঘৃণা ও অপমান-অপদস্ত করা। কাউকেই পেলে অমনি আঙ্গুল দিয়ে সংকেত দেয়া এবং চোখ দিয়ে কটাক্ষ করা। কারও বংশের উপর অভিশাপ দেয়া এবং কলঙ্কিত করা। কারও ব্যক্তি চরিত্রে দোষ বের করা। কাউকেও সামনা সামনি আঘাত করা। কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষ রটিয়ে বেড়ানো। চোগলখুরী ও কুটনাগিরি করা। একজনের কথা অন্য জনকে বলা। একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে উত্তেজিত করে বন্ধুকে শত্রু বানানো। কোথাও ভাইদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দেয়া। লোকদের খারাপ নাম রাখা, বিদ্রুপ করা এবং কলঙ্ক রটানো, সেইসব লোকদের বদ অভ্যাস সম্পর্কেই এখানে বলা হয়েছে, যা অত্যন্ত গর্হিত এবং জঘণ্য অপরাধমূলক কাজ। ফলে এর শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন। এদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, তাদের ধ্বংশ নিশ্চিত।

সূরা হুজুরাতের ১২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

www.icsbook.info

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ۔

"আর তোমরা কেউ কারও গোপনীয় বিষয় খুঁজে বেড়িয়ে না এবং কেউ কারও অসাক্ষাতে গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মরা ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? অথচ তোমরা তা ঘৃণাই করো।"

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন–

شرا عباد الله تعلى المشاؤن بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون للبراء العنت

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষ (পশ্চাতে) নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরাপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে বেড়ায়।"

হাদীসে আরও উল্লেখ রয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّمِيْمَةِ وَنَهٰى عَنِ الْغِيْبَةِ وَعَنِ الْاِسْتِمَاعِ الْغِيْبَةِ۔

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) চোগলখোরী করতে নিষেধ করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি গীবত বলতে ও শুনতেও নিষেধ করেছেন।" (সহীহ বুখারী)

চোগলখোরী ও গীবতের পরিণতি সম্পর্কে মহানবী (সঃ) বলেন–

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

"হযরত হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলীম)

তৃতীয় যে নৈতিক ত্রুটি বা দোষ তা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন–

اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ

যে অর্থ-সম্পদ জমা করে এবং তা গুনে গুনে রাখে। আর মনে করে যে, তার এই অর্থ-সম্পদ তাকে অমর বা চিরঞ্জীব করে রাখবে।

www.icsbook.info

অর্থাৎ মানুষের তৃতীয় যে নৈতিক দোষ-ত্রুটি এবং বদ অভ্যাস তা হলো অর্থ লিপ্সা বা অর্থপূজা।

এ আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, অর্থলিপ্সা বা অর্থপূজার কারণে সে তা বারবার গুনে গুনে দেখে আর মনে করে যে, এ অর্থই তাকে অমর বা চিরঞ্জীব করে রাখবে। অর্থাৎ তার এই পুঞ্জীকৃত অর্থ-সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী জীবন দান করবে, তাকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবে এবং রক্ষা করবে।

আল্লাহর বিধান হলো- প্রত্যেক মানুষই ক্ষণস্থায়ী, চিরঞ্জীব নয়। যখন তার বিদায়ের ঘন্টা বেজে যাবে তখন কোন শক্তিই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

অথচ অর্থ ও ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা এবং তা গুনে গুনে হিসাব রাখার কাজে সে এতই মশগুল যে, তাকে যে মরতে হবে সেকথাও সে বেমা'লুম ভুলে গেছে। মরার কথা তার স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। তাকে যে এসব কিছু ছেড়েছুড়ে এ দুনিয়া থেকে চিরদিনের তরে খালি হাতে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে, সে কথাও কোন এক মুহূর্তের জন্যও তার স্মরণে আসে না।

যাদের মধ্যে উপরোক্ত এই তিনটি বড় বড় নৈতিক ত্রুটি ও দোষ রয়েছে তাদের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন-

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ -

কক্ষণও নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।

حُطَمَةٌ - আরবী শব্দটির মূল শব্দ হলো- حُطَمٌ - এর অর্থ হলো-ভেঙ্গে ফেলা, চূর্ণবিচূর্ণ করা ও নিস্পেষিত করা।

জাহান্নামের সাতটি স্তর বা নামের মধ্যে 'হুতামাহ' হলো একটি স্তর বা নাম। এর নাম এই জন্যই রাখা হয়েছে যে, তাতে যাই নিক্ষিপ্ত হবে, তার সীমাহীন গভীরতা এবং আগুনের প্রজ্জ্বলন ও প্রচন্ডতা দ্বারা তাকে ছিন্নভিন্ন এবং চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলবে।

لَيُنْۢبَذَنَّ -শব্দটি نَبْذٌ শব্দ থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ হলো-কোন জিনিসকে নীচ বা হীন ও নগণ্য মনে করে ফেলে দেয়া, নিক্ষেপ করা। সুতরাং এ

www.icsbook.info

থেকে বুঝা যায় যে, যে প্রত্যক্ষ বা সামনাসামনি ধিক্কার দেয়, পেছনে বা অসাক্ষাতে গীবত বা পরনীন্দা করে বেড়ায় এবং অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে নিজেকে একজন ধনী মনে করে কিয়ামতের দিন এসব লোককে অত্যন্ত ঘৃণাভরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা 'হুতামাহ' নামক জাহান্নামের ভয়াবহাতা ও প্রচন্ডতা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রশ্নাকারে নবীজী বলেন–

وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ -তুমি কি জান, হুতামাহ (চূর্ণবিচূর্ণকারী) কি?

প্রতিউত্তরে আল্লাহ নিজেই হুতামাহর বর্ণনা দিয়ে বলেন–

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ○ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ

তা হলো আল্লাহর প্রজ্জলিত আগুন। যা (মানুষের) অন্তর বা দিল পর্যন্ত পৌছে যাবে।

এখানে হুতামাহ নামক জাহান্নামের আগুনকে 'আল্লাহর আগুন' বলা হয়েছে। আল কুরআনে এ স্থান ছাড়া আর কোন স্থানেই জাহান্নামকে 'আল্লাহর আগুন' বলা হয়নি। এখানে 'আল্লাহর আগুন' বলার মাধ্যমে একদিকে যেমন তার ভয়াবহতা প্রকাশিত হয়েছে অপরদিকে তেমনি সেই সঙ্গে এ কথাও জানা যাচ্ছে যে, যারা মানুষকে সাক্ষাতে বা সামনাসামনি ধিক্কার এবং গালাগালি দিয়ে অপমান-অপদস্ত করে, পেছনে বা অসাক্ষাতে কুৎসা রটিয়ে এবং গীবত করে অপরের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে, আর অগাধ অর্থ-সম্পদের মালিক বলে নিজেকে বড় মনে করে গর্ব-অহংকারে নিমজ্জিত হয়, আল্লাহ তাদেরকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন এবং কিয়ামতের দিন তাদের প্রতি অত্যন্ত তীব্র ক্রোধের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন। আর এই কারণেই তিনি তাদেরকে যে আগুনে নিক্ষেপ করবেন- সেই আগুনকে নিজের আগুন বলে অবহিত করেছেন।

تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ এর تَطَّلِعُ শব্দটি اِطَّلَعَ হতে এসেছে। এর দু'টি অর্থের একটি অর্থ হলো- উদয় হওয়া, উপরে পৌছে যাওয়া। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো- অবগত হওয়া, খবর পাওয়া।

اَفْـِٕدَةٌ - শব্দটি বহুবচন। এর একবচন শব্দ হলো- فُؤَادٌ যার অর্থ- দিল বা হৃদয় বা অন্তর। বুকের মধ্যে সদাসর্বদা স্পন্দনকৃত হৃৎপিন্ডকে

www.icsbook.info

'ফুয়াদ' বলা হয় না। বরং মানুষের চেতনা-অনুভূতি, আবেগ-উচ্ছাস, কামনা-বাসনা, আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, ইচ্ছা ও মনমানসিকতার উৎস মুখ ই হলো 'ফুয়াদ'। এর কয়েকটি অর্থ করা যেতে পারে। যেমন-

প্রথম অর্থ ঃ মানুষের খারাপ চিন্তা-চেতনা, ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, অশ্লীল কামনা-বাসনা ও আবেগ-উচ্ছাস এবং প্রখর খারাপ ইচ্ছা-বাসনার কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত এই আগুন পৌঁছে যাবে।

দ্বিতীয় অর্থ ঃ আল্লাহর সেই আগুন দুনিয়ার আগুনের ন্যায় অন্ধ ও বিবেচনাহীন হবে না। যে লোক আগুনের শাস্তি পেতে পারে, আর যে পেতে পারে না, এমন সকলকেই সেই আগুন সমানভাবে জ্বালাবে না। বরং তা এক একজন পাপীর অন্তর বা দিল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং তার প্রাপ্য পরিমান আযাব দেবে।

তৃতীয় অর্থ ঃ সাধারণত দুনিয়ার আগুনের বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে যা কিছুই নিক্ষিপ্ত হবে তা সবই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। মানুষও তাতে নিক্ষিপ্ত হলে তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ হৃদয়ও জ্বলে-পুড়ে যাবে।

এখানে জাহান্নামের আগুনের এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ হলো এই যে, দুনিয়ার আগুন মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় বা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছার আগেই মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। কিন্তু জাহান্নামে মৃত্যু হবে না। বরং তাতে জীবিত অবস্থায় হৃদয় পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেয়া হবে। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন তাকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে কিন্তু তার মৃত্যু হবে না।

হযরত সাবিত বানানী (রহঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করে যখন এর অর্থ বর্ণনা করতেন, তখন কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেন, "আল্লাহর আযাব তাদেরকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়েছে।"

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (রহঃ) বর্ণনা করেন, "প্রজ্জ্বলিত আগুন কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তারপর ফিরে আসে, আবার পৌঁছে"।

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেন-

إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ **-অবশ্যই তা তাদের উপর ঢেকে বন্ধ করে দেয়া হবে।**

অর্থাৎ অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপের পর ভাতের চাল দ্রুত সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য যেমন হাঁড়ির মুখ ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়, তেমনি জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উপর হতে তার মুখ ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হবে। কোন দুয়ার বা জানালা খোলা থাকাতো দূরের কথা সামান্যতম একটি ছিদ্র পর্যন্তও খোলা থাকবে না।

সূরার সবশেষে মহান আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামীদের জাহান্নামে আটকিয়ে রাখা সম্পর্কে বলেন-

فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ -তাদেরকে উঁচু উঁচু খাম্বায় বা খুঁটিতে বেঁধে দেয়া হবে।

এই আয়াত বা বাক্যাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন-

প্রথম অর্থ হলো- জাহান্নামের দরজাসমূহ উপর থেকে বন্ধ করে দেয়ার পর উপরের দিকে বড় বড় খাম্বা বা স্তম্ভ বসিয়ে দেয়া হবে।

দ্বিতীয় অর্থ হলো- অপরাধী লোকদেরকে উঁচু উঁচু খাম্বা বা খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হবে।

তৃতীয় অর্থ হলো- সেই আগুনের লেলিহান শিখা লম্বা লম্বা খুঁটি বা স্তম্ভের ন্যায় উপর দিকে উঠতে থাকবে। এই অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) করেছেন। (তাফহীমুল কুরআন)

عَمَدٍ -এর অর্থে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এসব জাহান্নামীদের ঘাড়ে শিকল বাঁধা থাকবে। লম্বা লম্বা স্তম্ভের মধ্যে আবদ্ধ করে তাদের উপর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। সেই আগুনের লেলিহান শিখা বা স্তম্ভের মধ্যে তাদেরকে নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দেয়া হবে।

আবু সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, তাদের জন্যে ভারী বেড়ী এবং শিকল থাকবে। তাতে তাদেরকে বন্দী করে দেয়া হবে।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে 'সূরা হুমাযাহ' এর কিছু তথ্যসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হলো। এসব ব্যাখ্যা থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় রয়েছে তা হলো-

www.icsbook.info

○ আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপ্রিয়, আখিরাতকে ধ্বংশকারী নৈতিক-দোষ-ত্রুটি ও বদ অভ্যাস থেকে সদাসর্বদা দূরে থাকতে হবে।

○ মানুষ কষ্ট পায় অথবা অপমানিত হয় এমন আচরণ যেমন-সামনাসামনি গালাগাল করা বা ধিক্কার দেয়া কিম্বা তিরস্কার করা থেকে দূরে থাকতে হবে। চোখ বা হাতের ইশারা-ইঙ্গিতে অপমানকর কোনো অঙ্গভঙ্গি করা থেকে দূরে থাকতে হবে।

○ মানুষের অগোচরে, পশ্চাতে কিম্বা পেছনে গীবত করা যাবে না। পরনিন্দা-পরচর্চা করা যাবে না। দোষ প্রচার করা যাবে না এবং শোনাও যাবে না। যদি কেউ কারও গীবত করে তবে তার কাছ থেকে সরে যেতে হবে কিম্বা গীবত করা থেকে বাঁধা দান করতে হবে। কেননা, গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা করা এবং শোনা একই অপরাধ। এর শাস্তিও কঠিন।

○ অর্থ-সম্পদ সংগ্রহের জন্য সবকিছুকে ত্যাগ করে আত্মনিয়োগ করা যাবে না। অর্থই সবকিছুর মূল মনে করে তার পেছনেই সারাজীবন ছুটা যাবে না এবং জমাকৃত অর্থ-সম্পদ বার বার গুনে গুনে দেখা যাবে না। কেননা, এতে মানুষকে কৃপণ বানিয়ে দেয়। তাছাড়া অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় এবং পুঞ্জিভূত করার জন্য আল্লাহ, রাসূল এবং পরকাল ভুলে যাওয়া যাবে না। কেননা, অর্থ-সম্পদ আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয়, মৃত্যুর স্মরণ থেকে বেখিয়াল করে দেয়, ব্যক্তির মধ্যে ধনী ধনী ভাব সৃষ্টি করে অহংকারী করে দেয়। যা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় এবং গর্হিত অপরাধ।

○ পুঞ্জিকৃত অর্থ-সম্পদকেই মানুষের জীবন-মরণ মনে করা যাবে না। কেননা, টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ মানুষকে অমর করে রাখতে পারে না। চিরজীবন দান করতে পারে না। মানুষ মরণশীল, তাকে মরতেই হবে। কোন কিছুই তাকে তার মরণ থেকে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। মৃত্যুর সময় হলে এক মুহূর্তের জন্যও কেউ মরণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

○ সামনাসামনি গালমন্দ করা, ধিক্কার দেয়া, কিম্বা অপমানকর কোন মন্তব্য করা এবং পেছনে বা অসাক্ষাতে গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা করা, দোষ-ত্রুটি প্রচার করে বেড়ানো এবং অর্থলিপ্সু বা অর্থপূজায় সবকিছু ভুলে সারা জীবন অর্থের পেছনে ঘুরে বেড়ানো, অগাধ অর্থ-সম্পদের মালিক হয়ে

www.icsbook.info

ধনী ধনী ভাব সৃষ্টি হয়ে অহংকার করা ও অর্থ-সম্পদকেই জীবনের সবকিছু মনে করা-এসব অনৈতিক কার্যক্রমের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। যাদের স্থান হবে চূর্ণবিচূর্ণকারী হুতামাহ নামক জাহান্নামে। যার আযাবও অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং পরকালের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্যই উপরে উল্লেখিত হুকুকুল ইবাদ (বান্দার অধিকার) এবং হুকুকুল্লাহ (আল্লাহর অধিকার) পরিপন্থী অনৈতিক কার্যক্রম থেকে দূরে থাকতে হবে।

আহ্বান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা 'হুমাযাহ' এর যে দারস পেশ করা হলো এতে যদি আমার অজান্তে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমরা যেসব শিক্ষনীয় বিষয় জানতে পারলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। অয়াআখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

www.icsbook.info

সাত

আল্লাহর বাছাইকৃত মুমিনদের প্রকৃত জিহাদ বা আন্দোলন করা কর্তব্য

সূরা হজ্ব আয়াত- ৭৮

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَاجْتَبٰكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَمَوْلٰكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (৭৮) তোমরা আল্লাহর জন্যে জিহাদ (আন্দোলন-সংগ্রাম) করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের (দ্বীনের) জন্যে বাছাই করে নিয়েছেন। আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছিলেন, আর এই কুরআনেও (তোমাদের এই নাম রেখেছেন) যেন রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা হন, আর তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো। কেননা, তিনিই তোমাদের মাওলা (অভিভাবক)। তিনি কতইনা উত্তম মাওলা এবং কতো উত্তম সাহায্যকারী।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَ -আর/এবং। جَاهِدُوْا -তোমরা জিহাদ/সংগ্রাম/

www.icsbook.info

আন্দোলন করো। فِى اللهِ -আল্লাহর জন্যে। حَقَّ -যথাযথ/প্রকৃত। جِهَادِهٖ -তার জিহাদ। هُوَ -তিনি। اِجْتَبٰكُمْ -তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন। مَا -না। جَعَلَ -আরোপ করেছেন। عَلَيْكُمْ -তোমাদের উপর। فِى الدِّيْنِ -দ্বীনের বিষয়ে/ব্যাপারে। حَرَجٍ -সংকীর্ণতা। مِلَّةَ -মিল্লাত/দ্বীন। اَبِيْكُمْ -তোমাদের পিতার। هُوَ -তিনি। سَمّٰكُمُ -তোমাদের নাম দিয়েছেন/রেখেছেন। قَبْلُ -পূর্বে। هٰذَا -এই। لِيَكُوْنَ -যেন হয়। شَهِيْدًا -সাক্ষী/সাক্ষদাতা। عليكم -তোমাদের উপর। تَكُوْنُوْا -তোমরাও হও। شُهَدَاءَ -সাক্ষী। عَلَى -উপর। النَّاسِ -সমস্ত লোকদের। فَاَقِيْمُوْا - সুতরাং তোমরা কায়েম/ প্রতিষ্ঠা করো। اٰتُوا-দাও। اِعْتَصِمُوْا-তোমরা আঁকড়ে ধরো। بِاللهِ-আল্লাহকে। هُوَ -তিনিই। مَوْلٰكُمْ -তোমাদের অভিভাবক। فَنِعْمَ-অতএব কতো উত্তম। اَلْمَوْلٰى -অভিভাবক। نِعْمَ-কতো উত্তম। النَّصِيْرُ -সাহায্যকারী।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে/মাহফিলে উপস্থিত প্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের ভাইয়েরা/বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য সূরা আল হজ্ব এর সর্বশেষ আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে তাওফীক দেন আপনাদের সামনে পেশকৃত দারসটি সঠিকভাবে তুলে ধরার।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার চতুর্থ রুকুর দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত- وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ "হজ্ব উদযাপনের জন্য লোকদেরকে আহবান জানাও"- এর الحج শব্দটিকে অন্যান্য সূরার ন্যায় প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে এই সূরার নামকরণ "সূরা আল হজ্ব" করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ এই সূরার মধ্যে মাক্কী এবং মাদানী সূরা সমূহের বৈশিষ্ট্য মিশ্রভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণে সূরাটি মাক্কী না মাদানী এই বিষয়ে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতোবিরোধ দেখা যায়। মাক্কী-মাদানী উভয় বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ দেখা যাওয়ার কারণ হলো, একটি

অংশ মাদানী জীবনের প্রথম ভাগে অবতীর্ণ হয়েছে আবার অন্য একটি অংশ মাক্কী জীবনের শেষ দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে এই সূরার মধ্যে উভয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যই বর্তমান রয়েছে।

সূরার প্রথম থেকে শুরু করে ২৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত সম্ভবত মাক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ হিজরাতের কিছুকাল পূর্বে নাযিল হয়েছে। অতঃপর ২৫ নম্বর আয়াত থেকে বিষয়বস্তুর ধারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। আর এতে স্পষ্ট মনে হয় যে, এই আয়াত হতে সূরার শেষ পর্যন্ত মাদানী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে। আর সম্ভবত হিজরতের পর প্রথম বছর জিলহজ্ব মাসেই অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। (আল্লাহই ভাল জানেন)

সূরার আলোচ্য বিষয় ঃ এই সূরায় তিন শ্রেণীর লোককে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। তারা হলো- (১) মক্কার মুশরিক (২) দ্বিধাগ্রস্থ ও সন্দেহ-সংশয়গ্রস্থ মুসলিম এবং (৩) খাঁটি মুসলমান।

প্রথমতঃ মুশরিকদের সম্বোধন করে কথা বলা শুরু হয়েছে মক্কায়। আর মদীনায় এসে এর ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ হয়েছে। তাদেরকে জোরালো ভাবে সাবধান ও সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের অজ্ঞতা এবং ভিত্তিহীন চিন্তা বিশ্বাসের ব্যাপারে যে যিদ এবং হঠকারিতা দেখাচ্ছো। আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব দেব-দেবীর উপর আস্থা-বিশ্বাস দেখাচ্ছো যাদের কোন শক্তি-সামর্থ নেই। অপরদিকে তোমরা আল্লাহর রাসূলকে অবিশ্বাস-অমান্য করছো। এখন তোমাদের পরিণাম সেইসব লোকদের মতোই হবে ইতোপূর্বে এই নীতি গ্রহণকারীদের পরিণাম যা হয়েছে।

নবীকে অবিশ্বাস ও অমান্য করে এবং নিজ জাতির সবচেয়ে ভাল ও সৎ-চরিত্রবান ও ভদ্রলোকদেরকে অত্যাচার-যুলুমের মাধ্যমে নিজেদেরই ক্ষতি ডেকে এনেছো। তোমাদের এই আচরণের ফলে তোমাদের উপর আল্লাহর যে গযব নেমে আসবে, তা থেকে তোমাদেরকে তোমাদের মনগড়া ও কৃত্রিম মা'বুদেরা তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা মক্কার মুশরিকদেরকে শুধু সাবধান-সতর্কই করেন নাই। সাথে সাথে তাদেরকে পুরো সূরায় বিভিন্ন ভাবে উপদেশ-নসিহত দ্বারা বুঝানোরও চেষ্টা করা হয়েছে।

www.icsbook.info

দ্বিতীয়ত ঃ দ্বিধাগ্রস্থ ও সংশয়-সন্দেহপূর্ণ মুসলমানদের অবস্থা ছিলো এই যে, তারা আল্লাহর বন্দেগী কবুল করে নিয়েছিলো বটে কিন্তু এই পথে যে বিপদ ও ঝুঁকি আছে তা তারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলো না। এই সূরাই তাদেরকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, এটা তোমাদের কেমন ঈমান? আরাম-আয়েশ এবং ভোগ-বিলাসের সুযোগ আসলেতো তোমরা আল্লাহকে আল্লাহ বলে মেনে নাও, আর তাঁর বান্দাহ হয়ে থাকতেও রাজী হয়ে যাও। কিন্তু যখনই আল্লাহর পথে বিপদ আসে, ঝুঁকি আসে, কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন হয়, তখন না আল্লাহকে আল্লাহ বলে মানতে রাজী হও, আর না তার বান্দাহ থাকতে সম্মত হও। অথচ তোমরা এরূপ রীতি ও আচরণ গ্রহণ করে এমন কোন বিপদ-মুসিবতকে এড়িয়ে চলতে পারো না, যা আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছেন।

তৃতীয়ত ঃ খাঁটি মুসলমানদের সম্মোধন করে এই সূরায় দুই ধরনের কথা বলা হয়েছে। যেমন–

ক) এক ধরনের সম্মোধন তাদের নিজেদেরকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে এবং আরব দেশের জনমতকে উদ্দেশ্য করেও করা হয়েছে।

খ) অপর ধরনের সম্মোধন করা হয়েছে কেবলমাত্র ঈমানদার লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে।

প্রথম ধরনের সম্মোধনে মক্কার মুশরিকদের আচার-আচরণের বিষয়ে পাকড়াও করা হয়েছে। তারা মুসলমানদের জন্য 'মসজিদে হারামের' পথ বন্ধ করে দেয়ার কারণে তাদেরকে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করা হয়েছে। 'মসজিদে হারাম' তাদের নিজস্ব ও ব্যক্তিগত কোন সহায় সম্পদ নয়। কাউকেও হজ্ব পালন হতে মাহরূম করা তাদের কোন অধিকার নাই। এই আপত্তিটা কেবল সত্যভিত্তিকই ছিলো না, বরং রাজনৈতিক দিক দিয়েও এটা কুরাইশদের বিরুদ্ধে এক বড় হাতিয়ারও ছিলো। এই নৈতিক ও রাজনৈতিক আপত্তির মাধ্যমে আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকদের মনেও প্রশ্ন জাগিয়ে তোলা হয়েছিলো যে, কুরাইশরা কেন এমন আচরণ করে? ত তাদের কি হেরেম শরীফের মালিকনা শুধু রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব? এখন যদি তারা কেবল ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে এক শ্রেণীর লোককে হজ্ব পালন করা থেকে মাহরূম করে এবং তা সহ্য করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে যাদের সাথেই তাদের সম্পর্ক খারাপ হবে, তাদেরকেই

www.icsbook.info

তো তারা 'মসজিদে হারাম'-এ প্রবেশে বাধাদান করতে এবং হজ্ব ও উমরা পালন বন্ধ করে দিতে সাহস পাবে। এই প্রসঙ্গে 'মসজিদে হারাম' এর ইতিহাস বর্ণনা করতে যেয়ে একদিকে বলা হয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর আদেশে যখন তাকে নির্মাণ করেন, তখন সমস্ত মানুষের জন্যই হজ্ব ও উমরা পালনের সাধারন অনুমতি দেয়া হয়েছিলো এবং প্রথম দিন থেকেই স্থানীয় বাসিন্দা এবং বাহির থেকে আগত লোকদের সেখানে প্রবেশের সমান অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়েছিলো। অপরদিকে বলা হয়েছে- এই ঘর শিরক করার জন্য নয়, বরং এক আল্লাহর বন্দেগী করার জন্যই নির্মাণ করা হয়েছে। এখন সেখানে এক আল্লাহর বন্দেগী করা হবে নিষিদ্ধ আর মূর্তি পূজা করার জন্য থাকবে অবাধ স্বাধীনতা-এটা খুবই আপত্তিজনক।

দ্বিতীয় ধরনের সম্বোধনে মুসলমানদেরকে কুরাইশদের যুলুম-নির্যাতনের জবাবে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা শক্তি প্রদর্শনের এটাই প্রথম আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি। সেই সংগে তাদেরকে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যখন ক্ষমতা লাভ করবে,তখন তোমাদের আচরণ হবে আদর্শ ভিত্তিক। তাদের শাসন ক্ষমতার লক্ষ্য কি হবে, কি উদ্দেশ্যে কাজ করবে তাও এই সূরাই স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। এই কথাগুলো সূরার মাঝখানেও বলা হয়েছে এবং সূরার শেষ ভাগেও বলা হয়েছে।

সূরার শেষ ভাগে অর্থাৎ যে অংশ থেকে দারস পেশ করা হচ্ছে, সেখানে ঈমানদারদের আল্লাহরই জন্য প্রকৃত জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে 'মুসলিম' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এর স্থলাভিষিক্ত আসল লোক। তোমাদেরকে দুনিয়ার মানুষের জন্য সত্যের স্বাক্ষ্যদানের কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে দাঁড় করানো হয়েছে। অতএব এখন তোমাদের সালাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাকাত আদায় করতে হবে এবং উত্তম ও মঙ্গলজনক কাজ করতে হবে। নিজেদের জীবনকে উত্তম আদর্শ জীবনরূপে গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে এবং জিহাদ-সংগ্রাম-আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য প্রাথমিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা

www.icsbook.info

হলো। এখন আমি তিলাওয়াতকৃত দীর্ঘ আয়াতটির ব্যাখ্যা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি।

আয়াতের প্রথমেই আল্লাহর জন্যই প্রকৃত জিহাদ বা আন্দোলনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন- وَجَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ

তোমরা আল্লাহর জন্যই জিহাদ করো, যেভাবে জিহাদ-সংগ্রাম করা উচিত।

جِهَادٌ (জিহাদ)-অর্থ কেবলমাত্র সম্মুখ যুদ্ধ বা হত্যাকান্ড চালানই নয়। কেননা, جِهَادٌ শব্দটি جَهْدٌ বা جُهْدٌ শব্দ থেকে এসেছে। যার আভিধানিক অর্থ হলো- কষ্ট-কাঠিণ্য, কঠোর পরিশ্রম, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সর্বশক্তি নিয়োগ, প্রানান্তকর চেষ্টা সাধনা বা চূড়ান্ত চেষ্টা সাধনা করা। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইসলাম বিরোধী সকল প্রকার প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে জান-মাল, অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান-বুদ্ধি, কর্মকৌশল, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং শক্তি-সামর্থ উৎসর্গ করে সর্বাত্মক ও চূড়ান্ত চেষ্টা-সংগ্রাম বা মুজাহাদা করার নামই হলো জিহাদ।

فِى اللهِ - "আল্লাহর জন্যে" এই ব্যাক্যটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্য যায়গায় জিহাদের নির্দেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন-

فِى سَبِيْلِ اللهِ -"আল্লাহর পথে বা রাস্তায়"। আর এখানে سَبِيْلِ বা রাস্তা বাদ দিয়ে সরাসরি বলা হয়েছে- فِى اللهِ "আল্লাহর উদ্দেশ্যে"। এই শব্দ দিয়ে জিহাদের একটি শর্ত হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিয়ে বলা হচ্ছে যে, প্রতিরোধকারী শক্তি হচ্ছে সেগুলো- যা আল্লাহর বন্দেগী, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা এবং তাঁর নির্দিষ্ট পথে চলার প্রতিবন্ধক। এই প্রেক্ষিতে চেষ্টা ও সাধনা করার লক্ষ্য এই যে, এসব শক্তির প্রতিরোধকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে মানুষ নিজেও যথাযথভাবে আল্লাহর বন্দেগী করবে, আর সেই সঙ্গে দুনিয়াতেও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ বা উঁচু করবে এবং কুফর ও খোদাদ্রোহী নাস্তিক্যবাদ শক্তিকে নাস্তানুবাদ বা পরাজিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রাণপণ জিহাদ-সংগ্রাম করবে।

حَقَّ جِهَادِهِ -"প্রকৃত জিহাদ বা যেভাবে জিহাদ করা উচিত।" অর্থাৎ

জিহাদ বা আন্দোলন-সংগ্রামের হক আদায় করে জিহাদ করা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহকে ভয় করা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে-

اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ - "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেভাবে ভয় করা উচিত।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) حَقَّ جِهَادِهٖ এর অর্থে বলেন- "জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা।" অর্থাৎ জিহাদে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি, ঠাট্টা-বিদ্রুপকে উপেক্ষা করে নিরবচ্ছিন্নভাবে জিহাদ করা আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন, এখানে জিহাদ বলে নিজের প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা বুঝানো হয়েছে এবং এটাই حَقَّ جِهَادِهٖ বা যথাযোগ্য জিহাদ।

ইমাম বগভী প্রমুখ এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন- (হাদীসের সনদটি দূর্বল) একবার সাহাবায়ে কিরামের একটি দল কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে ফিরে আসলে নবী করীম (সঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন - قَدِمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ "তোমরা ছোট জিহাদ হতে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছো।"জিজ্ঞাসা করা হলো, সেই বড় জিহাদ কি? নবী করীম (সঃ) তখন বললেন - مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ "বান্দার নিজের নফসের খাহেশের বিরুদ্ধে চেষ্টা ও সাধনা করা।" এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করে বলেছেন যে, এর সনদে ত্রুটি রয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

حَقَّ جِهَادِهٖ তথা 'প্রকৃত জিহাদের' অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সাধনা-সংগ্রামের প্রথম আঘাত আসে ব্যক্তির নিজের নফসের খায়েশের বিরুদ্ধে। কেননা, তা প্রতিমুহূর্তে আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য চেষ্টায় রতো থাকে এবং ব্যক্তিকে ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে অবিরাম চেষ্টা চালাতে থাকে। তাই উহাকে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুগত ও নিয়ন্ত্রণ করা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাই বান্দার নিজের

www.icsbook.info

নফস বা আত্মার খায়েশের বিরুদ্ধে চেষ্টা-সাধনা করা। তারপর জিহাদের বিশাল ক্ষেত্র গোটা দুনিয়ায় বিস্তৃত করা। অর্থাৎ দুনিয়ায় খোদাদ্রোহী যতো শক্তি আছে তার বিরুদ্ধে জান-প্রাণ, অর্থ-সম্পদ, বুদ্ধি-কৌশল, শক্তি-সামর্থ দিয়ে প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাওয়া।

حَقَّ جِهَادِهٖ "জিহাদের মতো জিহাদ" এই বাক্যটির তাৎপর্য আমরা আমাদের সমাজে প্রচলিত কতকগুলো মন্তব্যের সাথে তুলনা করতে পারি। যেমন-কোন কাজকে নিখুঁত এবং ভালো ভাবে করার জন্য তাগাদা দিয়ে বলা হয়- "কাজের মতো কাজ করো" অর্থাৎ কাজ যেভাবে করা উচিত সেভাবে কাজ করো। আবার পড়ার ক্ষেত্রে বলা হয়- "পড়ার মতো পড়ো"। অর্থাৎ যেভাবে পড়া উচিত সেভাবে পড়ো। আবার লিখার ক্ষেত্রে বলা হয়- "লিখার মতো লিখো"। অর্থাৎ যেভাবে লিখা উচিত সেভাবে লিখ। আবার খেলার বিষয়ে বলা হয়- "খেলার মতো খেলো"। অর্থাৎ যেভাবে খেলা উচিত সেভাবে খেলো ইত্যাদি। সুতরাং জিহাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর এই নির্দেশ হলো- حَقَّ جِهَادِهٖ "জিহাদ করার মতো জিহাদ করো।" অর্থাৎ যেভাবে জিহাদ করা উচিত সেভাবে হক আদায় করে জিহাদ করো। সুতরাং জিহাদ বা চেষ্টা-সংগ্রাম হবে নিজের নফসের খায়েসের বিরুদ্ধে, অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা ইত্যাদি যা আল্লাহর হুকুম পালনে বাধা সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে। খোদাদ্রোহী শক্তি তথা নাস্তিকতার বিরুদ্ধে কথা,কাজ,কৌশল ইত্যাদির মাধ্যমে সকল প্রকার প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেও নিরবছিন্নভাবে অবিরাম গতিতে সর্বাত্তক চেষ্ট-সংগ্রাম চালিয়ে যাবার নামই হলো- حَقَّ جِهَادِهٖ বা প্রকৃত জিহাদ। (এর পরও আল্লাহই বেশী ভাল জানেন)।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

তিনিই তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্যে বাছাই করে নিয়েছেন। আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেন নাই।

هُوَ اجْتَبٰكُمْ এই বাক্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতির মধ্য থেকে উম্মতে মুহাম্মদিকে তার কাজের জন্য অর্থাৎ দ্বীনের জন্য বাছাই করে

নিয়েছেন বা মনোনীত করেছেন। অন্যান্য উম্মতবর্গের উপর তিনি তোমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন।

কুরআনের অন্যান্য আয়াতে মহান আল্লাহ পাক উম্মতে মুহম্মদিকে এভাবে উল্লেখ করেছেন - جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا - "তোমাদেরকে মধ্যবর্তী জাতি বানানো হয়েছে।" (সূরা বাকারা - ১৪৩)

অন্য এক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে-كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ "তোমরাই হচ্ছো উত্তম জাতি, তোমাদেরকে জনগণের জন্য তৈরী করা হয়েছে।" (সূরা ঈমরান- ১১০)

জেনে রাখা উচিত যে, এই আয়াতটিতে সাহাবাদের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। এরপর অন্যান্য লোকেরা শামিল হতে পারে যারা তাঁদেরকে অনুসরণ করবে।

তিনি নিজের কাজের জন্য বাছায় করে নিয়ে উম্মতে মুহাম্মদিকে কয়েক ভাবে মহা সম্মানিত করেছেন। যেমন, প্রথমতঃ পূর্ণ রাসূল ও বিশ্ব নবী প্রেরণ করে মর্যাদা দান করেছেন, যা পূর্বে কোন নবীই পূর্ণ বা বিশ্ব নবী ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ পূর্ণ শরীয়ত দানের মাধ্যমে মর্যাদা দান করেছেন, যা পূর্বে কোন সময় পূর্ণ শরীয়ত বলবত ছিলো না। তৃতীয়তঃ সহজ এবং উত্তম দ্বীন প্রদান করে মর্যাদা দান করেছেন, যা পূর্বে এরকম সহজ দ্বীন ছিলো না। চতুর্থতঃ উম্মতে মুহাম্মদীর উপর এমন কঠিন আহকাম দেন নাই যা পালন করা কঠিন। কিন্তু পূর্বের উম্মতদের উপর অত্যন্ত কঠিন আহকাম বলবত ছিলো। পঞ্চমতঃ এমন বোঝা তিনি চাপিয়ে দেন নাই যা বহন করা উম্মতের সাধ্যের বাইরে।

অতঃপর আয়াতের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

আর তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন প্রকার সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেন নাই।

অর্থাৎ তোমাদের দ্বীনকে সেই সব বাধা-বন্ধন হতে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যা অতীত উম্মতের উপর তাদের ফকীর, পীর, আলিম ও পাদ্রীরা চাপিয়ে দিয়ে দ্বীনকে সংকীর্ণ করে দিয়েছিলো। পক্ষান্তরে এই দ্বীনে চিন্তা

গবেষণার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। শরীয়ত এবং আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে থেকে বাস্তব কর্মজীবনে তমদ্দুন ও সমাজ উন্নতির ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, যুদ্ধ-সন্ধি সকল ক্ষেত্রে মানুষের জন্যে কল্যাণধর্মী এক উদার দ্বীন মহান আল্লাহ্ পাক উম্মতে মুহাম্মদিকে দান করেছেন। এই আয়াতে কথাটিকে ইতিবাচক ভাবে বলা হয়েছে, অন্য আয়াতে সেসব বিষয়ই আবার নেতিবাচক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে–

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ --- (الخ)

"(এই রাসূল) তাদেরকে জানা-চেনা নেক কাজের আদেশ করেন এবং সেইসব খারাপ কাজ হতে বিরত রাখেন, যা মানুষের প্রকৃতিই খারাপ মনে করে। আর সেইসব জিনিস হালাল ঘোষণা করেন, যা পাক ও পবিত্র এবং হারাম ঘোষণা করেন সেইসব জিনিস যা খারাপ। আর তাদের উপর হতে সেই সব কঠিন বোঝা নামিয়ে দেন যা তাদের উপর চাপানো ছিলো। সেইসব জিঞ্জিরগুলি খুলে ফেলেন, যাতে তারা বন্দি ছিলো।"

(সূরা আ'রাফ -১৫৭)

দ্বীনের মধ্যে ইবাদতের ক্ষেত্রেও কোন সংকীর্ণতা নেই যেমন-পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের মর্যাদা পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে নিহিত রেখেছেন। বাড়িতে থাকাকালীন চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরজ নামায চার রাকাআতই পড়তে হয়। আর সফরে চার রাকাআতের স্থলে দুই রাকাআত পড়তে হয়। যুদ্ধের বা ভয়ের নামায হাদীস অনুযায়ী মাত্র এক রাকাআত পড়লেই হয়ে যায়। অসুস্থ মানুষ বসে নামায পড়তে পারে এবং বসে পড়তে না পারলে শুয়েও পড়তে পারবে, এমনকি ইশারাতেও নামায পড়তে পারবে। এছাড়া অন্যান্য ফরজ এবং ওয়াজিব ইবাদাতগুলোও সহজ সাধ্য করেছেন এজন্যই নবী করীম (সঃ) বলতেন, "আমি একনিষ্ঠ ও খুবই সহজ দ্বীন নিয়ে আগমন করেছি।"

হযরত মু'য়াজ (রাঃ) এবং হযরত আবু মুসা (রাঃ) কে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইয়ামানের আমীর (শাসক) নিযুক্ত করে পাঠান তখন তাঁদেরকে

www.icsbook.info

উপদেশ দিয়ে বলেন ঃ "তোমরা (জনগণকে) সুসংবাদ দিবে, তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করবে না এবং এমন কাজের নির্দেশ দিবে যা পালন করা তাদের পক্ষে সহজ সাধ্য হয়, কঠিন না হয়।" এই বিষয়ে আরো বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন- "তোমাদের দ্বীনে কোন সংকীর্ণতা এবং কোন কঠোরতা নেই।(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

অতঃপর আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ বলেন– مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ

তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো।

"মিল্লাতে ইব্রাহীম" বলতে এখানে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে একে "মিল্লাতে নূহ", "মিল্লাতে মূসা", "মিল্লাতে ঈসাও" বলা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও আল কুরআনে 'মিল্লাতে ইব্রাহীম' বার বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা অনুসরণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে সম্ভবতঃ তিনটি কারণে। যেমন–

প্রথম কারণ ঃ কুরআনে প্রথম সম্বোধন হলো আরববাসীদের প্রতি। কেননা, তারা যতোটা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে চিনতো-জানতো, ততোটা অন্য কাউকে চিনতোনা জানতোনা। তাদের ইতিহাস- ঐতিহ্য ও ভক্তি-শ্রদ্ধায় যে ব্যক্তির সবচেয়ে বেশী প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো, তিনি হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

দ্বিতীয় কারণ ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-ই ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি নেককার এবং মহান ব্যক্তি হওয়া সম্পর্কে ইহুদী, খৃষ্টান, আরবের মুশরিক ও মুসলমান সকলেই একমত ছিলো। এমনকি মধ্য প্রাচ্যের 'সাবেয়ী' লোকেরাও এটা মানতো। নবী-রাসূলগনের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যাঁকে সকলেই এক বাক্যে মেনে নিতো।

তৃতীয় কারণ ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অন্যসব মিল্লাত সৃষ্টির বহু পূর্বেই দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন। ইহুদী, খৃষ্টান, সাবেয়ী সম্প্রদায়তো এই ইতিহাস জানতো-এমন কি আরবের মুশরিকরাও জানতো যে, তাদের মূর্তি পূজার প্রচলন হয়েছে 'আমর ইবনে লুহাইর' সময় থেকে। সে ছিলো বনী খুযায়ার সর্দার। 'মায়াব' অঞ্চল হতে 'হুবল' নামক বুতটি এনেছিলো। কাজেই তাদের এই শিরকী মিল্লাতও হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কয়েকশো বছর পরে উদ্ভাবিত হয়েছে। এর পরিপেক্ষীতে মহাগ্রন্থ আল কুরআন যখন বলে তোমরা সকল মিল্লাতকে বাদ দিয়ে ইব্রাহীম (আঃ) এর মিল্লাতকে

www.icsbook.info

গ্রহণ করো। আর ইব্রাহীম (আঃ) এর মিল্লাততো ছিলো ইসলাম। আর আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এরও দাওয়াত সেই মিল্লাতেরই দিকে। আর এইজন্যই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে সবার পিতা বা জাতীয় পিতা বলা হয়।

পরবর্তী অংশে আল্লাহ বলেন- هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا

তিনি পূর্বেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন 'মুসলিম' এবং এই কুরআনেও (তোমাদের এই নাম রেখেছেন)।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এরও পূর্বে 'মুসলিম' নামকরণ করেন। কেননা, তাঁর প্রার্থনা ছিলো-

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দু'জন (ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আঃ) কে তোমার জন্য মুসলিম (অনুগত) বানাও এবং আমাদের পরবর্তী সন্তানদের মধ্যে থেকে একটি মিল্লাত মুসলিম (অনুগত) বানিয়ে দাও।" কোন কোন তাফসীরকারক 'তিনি পূর্বে মুসলিম নামকরণ করেছেন' বলতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে বুঝিয়েছেন। যদি তাই হতো তাহলে উপরে উল্লেখিত আয়াতের প্রার্থনায় 'মুসলিম' হওয়ার জন্য দোয়া করতেন না। তিনি নিজেইতো তাঁর সন্তান ইসমাঈল (আঃ) কে সাথে নিয়ে দোয়া করছেন- "হে আল্লাহ আমাদের দু'জনকে মুসলিম বানিয়ে দাও।"

সুতরাং এখানে 'তিনি' বলতে আল্লাহ, 'পূর্বে' বলতে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং 'এই কিতাব' বলতে সর্বশেষ কিতাব আল কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।

ইতোপূর্বে আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকে জিহাদের জন্য বাছাই করে নেয়া হয়েছে বলে উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের দ্বীন সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে সহজ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই দ্বীনের প্রতি আরও বেশী আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য বলা হচ্ছে-এটা হলো ঐ দ্বীন যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আনয়ন করেছিলেন। অতঃপর এই উম্মতের মর্যাদার জন্য এবং তাদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ বলেন, তোমাদের বর্ণনা আমার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও ছিলো। যুগ যুগ ধরে নবীদের উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবসমূহে তোমাদের আলোচনা হতে থেকেছে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের পাঠকেরা তোমাদের সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত। সুতরাং এই কুরআনের পূর্বে এবং এই কুরআনেও তোমাদের

www.icsbook.info

নাম 'মুসলিম'। আর এই নামকরণ করেছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের যে নাম রেখেছেন 'মুসলিম', সেই নামেই ডাকো। কেননা, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে যারাই আল্লাহর একাত্ববাদ, পরকাল, রিসালাত এবং আল্লাহর কিতাব বা সহীফাকে মান্য করে তারা সকলেই ছিলো মুসলিম। তারা কেউই ইব্রাহীম (আঃ) এর দল, মূসা (আঃ)এর দল, ঈশা (আঃ)এর দল বলে পরিচিত ছিলো না। তারা সকলেই ছিলো মুসলিম।

অতঃপর আয়াতের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ বলেন-

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ-

যেন রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী হন, আর তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত মানুষের জন্যে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন, তোমরা অন্যান্য নবীর উম্মতের ন্যায় উম্মত নও। কিম্বা তোমরা অন্যান্য জাতির ন্যায় জাতি নও। বরং তোমরা হচ্ছো সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত- 'উম্মতে মুহাম্মদী'। তোমরা হচ্ছো সর্বউত্তম জাতি মুসলিম জাতি। সুতরাং আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং মর্যাদাপূর্ণ জাতি মুসলিম এজন্যই করেছি যে, যাতে তোমাদের জন্য সাক্ষী হন মুহাম্মদ (সঃ) এবং তোমরাও সাক্ষী হও গোটা মানব জাতির জন্য।

সূরা বাকারার ১৪৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সাক্ষী সংক্রান্ত বিষয়ে একটু আগপিছু করে বলেন-

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا -

"আমি তোমাদেরকে এক অতিউত্তম মধ্যপন্থি জাতি বানিয়েছি এইজন্য যে, যাতে করে তোমরা মানুষের জন্যে সাক্ষী হও, আর রাসূলও হন তোমাদের জন্যে সাক্ষী।"

হাশরের মাঠে পূর্ববর্তী সকল উম্মতই 'উম্মতে মুহাম্মদীর' শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করবে। এই উম্মত সমস্ত উম্মতের উপর নেতৃত্ব লাভ করেছে বিধায় অন্যান্য উম্মতের উপর গ্রহণযোগ্য হবে। আর মুহাম্মদ (সঃ)ও হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি আল্লাহ তা'য়ালার বিধি-বিধান এই উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম, আর উম্মতে মুহাম্মদীও তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য নবীরা যখন এই দাবী করবেন তখন তাঁদের উম্মতেরা তা অস্বীকার করে বসবে। তখন উম্মতে মুহাম্মদীরা স্বাক্ষ্য দেবে

www.icsbook.info

যে, সকল নবীই তাঁদের উম্মতের নিকট আল্লাহর বিধি-বিধান নিশ্চিতভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তখন পূর্বের নবীদের উম্মতেরা জেরা করবে যে, আমাদের যামানায় উম্মতে মুহাম্মদীর অস্তিত্বই ছিলো না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপ্যারে কিভাবে স্বাক্ষ্য হতে পারে? তখন উম্মতে মুহাম্মদীর পক্ষ থেকে জেরার জবাবে বলা হবে, আমরা তখন উপস্থিত ছিলামনা বটে, কিন্তু আমরা আমাদের রাসূল (সঃ) এর মুখে শুনেছি, যার সত্যবাদীতাই কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা স্বাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষী গ্রহণ করা হবে।

এই সম্পর্কে মুসনাদ-ই-আহমাদের বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আঃ)-কে ডাকা হবে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে, "তুমি কি আমার বাণী আমার বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হে প্রভু! হ্যাঁ, আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি। অতঃপর তাঁর উম্মতকে ডাকা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, নূহ (আঃ) কি তোমাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন? তারা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করবে এবং বলবে, আমাদের নিকট ভয় প্রদর্শক আসেননি। তখন হযরত নূহ (আঃ) কে বলা হবে, তোমার উম্মততো অস্বীকার করছে সুতরাং তুমি স্বাক্ষী হাযির করো। তখন তিনি বলবেন, হ্যাঁ, মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর উম্মতগণই আমার স্বাক্ষী- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ আয়াতটির ভাবার্থ এটাই।

(এধরণের হাদীস সহীহ বুখারী, জামে' আত্ তিরমিজী, নাসায়ী এবং ইবনে মাযাতেও রয়েছে।)

সর্বশ্রেষ্ট এবং মর্যাদাপূর্ণ উম্মতে মুহাম্মদী মুসলিম জাতি দুনিয়ার জীবনে কিভাবে স্বাক্ষ্য দিয়ে তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখবে সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা, দুনিয়ার জীবনে তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে না পারলে কিয়ামতের দিন সে কোন ভাবেই স্বাক্ষী দিতে পারবে না। কেননা, মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে মুসলিম ঈমানদারদেরকে ডেকে বলেছেন- يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্যে সত্যের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়াও।"

(সূরা-নিসা -১৩৫)

আর এটা কোনো কথার কথা নয় বরং এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কড়া নির্দেশ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ

"তার চেয়ে আর কে বড় যালিম হতে পারে, যার কাছে আল্লাহর বিষয়ে স্বাক্ষ্য থাকার পরেও তা গোপন রাখে"? (সূরা বাকারা - ১৪০)

উম্মতে মুহাম্মাদী তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে ব্যার্থ হলে তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তোমাদের পূর্বে ইহুদী জাতিকে এ স্বাক্ষ্য দেয়ার জন্য দ্বায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তারা সত্যের কিছুটা গোপন করেছিলো আর কিছুটা তার বিপরীত স্বাক্ষ্য দান করেছিলো। ফলে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে এক প্রচন্ড আঘাতে সরিয়ে দিলেন এবং তাদের অবস্থা এরূপ দাঁড়ালো যে–

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوْبِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ -

"লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান, অধঃপতন ও দূরবস্থা তাদের উপর চেপে বসলো এবং তারা আল্লাহর গজবে নিমজ্জিত হয়ে পড়লো।"

উম্মতে মুহাম্মদী মুসলিম জাতির স্বাক্ষ্য দেয়ার পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত ঃ

স্বাক্ষ্য দু'ধরণের হয়ে থাকে। এক. মৌখিক স্বাক্ষ্য। দুই. বাস্তব স্বাক্ষ্য।

মৌখিক স্বাক্ষ্য ঃ নবী করীম (সঃ) এর মাধ্যমে আমাদের কাছে যে সত্য বাণী এসেছে তা নিজে স্বীকার ও গ্রহণ করা এবং দুনিয়ার অন্যান্য মানুষের কাছে বক্তৃতা ও লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরা। মানুষ যাতে বুঝতে পারে এবং গ্রহণ করতে পারে এমন সকল পথ-পন্থা অবলম্বন করে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং প্রচার-প্রোপাগান্ডার সম্ভাব্য সকল উপায় উপকরণ ব্যবহার করা এবং আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল মাধ্যমকে কজায় এনে আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের সাথে দুনিয়ার মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলিম জাতি মানুষকে হিদায়াতের পথ দেখানোর জন্য নবীদের ন্যায় চিন্তা-ভাবনা করবে, সে পর্যন্ত এ মৌখিক স্বাক্ষ্য দানের দ্বায়িত্ব পুরোপুরি আদায় হবে না। আর এ দ্বায়িত্ব পালন করতে না পারলে নবীও আমাদের জন্য স্বাক্ষ্যদাতা হবেন না।

বাস্তব স্বাক্ষ্য ঃ বাস্তব স্বাক্ষ্য দান হলো এই যে, যেসব নিয়ম নীতিকে সত্য বলে আমরা গ্রহণ করেছি ও প্রচার করেছি, আমাদের বাস্তব জীবনেও সেগুলোকে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা যাদের কাছে দাওয়াত দিচ্ছি তারা যেন আমাদের কাছ থেকে ঐসব নীতির কথাগুলো মৌখিক চর্চাই শুনতে না পায়, বরং তারা যেন স্বচক্ষে আমাদের জীবনে

ঐসবের সৌন্দর্য ও কল্যাণকারিতা দেখতে পায়। আমরা যদি ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে নিজেরা দ্বীনের বাস্তব স্বাক্ষ্যে পরিণত হতে পারি, আমাদের ব্যক্তি চরিত্র সততার প্রমাণ পেশ করে, আমাদের ঘর-বাড়ী সৌরভে মাতোয়ারা হয়ে উঠে, আমাদের দোকানপাট ও কলকারখানাগুলো তার রৌশনীতে ঝলমল করে উঠে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তারই আলোকে আলোকিত হয়ে উঠে, আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতা তারই সৌন্দর্য চর্চায় নিয়োজিত থাকে এবং আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, জাতীয় নীতি ও সকলের চেষ্টা সাধনা তার সত্যতার উজ্জল নিদর্শনে পরিণত হয়, তাহলে এ স্বাক্ষ্যদানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হয়েছে বলা যেতে পারে। আর তখনই সে উম্মতে মুহাম্মদী এবং মুসলিম জাতির মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হবে। তার তখনই কেবলমাত্র তার জন্য নবীও স্বাক্ষ্য দান করবেন। (তাফহীমূল কুরআন)

অতঃপর আয়াতের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে কতিপয় কাজের নির্দেশ দিয়ে বলেন-

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط

তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে মানুষের মাঝ থেকে বাছাই করে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে মুসলিম হিসেবে গণ্য করেছেন, আর এই মর্যাদার কারণে তোমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে গোটা মানব জাতির স্বাক্ষী বানিয়ে দিয়ে যে নি'য়ামত দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। অতএব আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের উপর যা কিছু ফরয করে দিয়েছেন তা অতি আগ্রহ ও নিষ্ঠার সাথে খুশীমনে পালন করা উচিত।

এখানে আল্লাহ মুসলমানদেরকে মৌলিক কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে বলেন-

প্রথম নির্দেশ হলো ঃ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ -নামায কায়েম করবে।অর্থাৎ মুসলিম পরিচয় দানকারী আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত- 'নামায' প্রতিষ্ঠা করবে। অর্থাৎ নামাযের ভিতর বাইরের যাবতীয় বিধিবিধান ও নিয়ম-কানুন মেনে যথাযথভাবে আদায় করে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে প্রতিষ্ঠা করবে।

www.icsbook.info

দ্বিতীয় নির্দেশ হলো ঃ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ -এবং যাকাত আদায় করবে। অর্থাৎ ইবাদতের মধ্যে নামাযের পরেই দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও পবিত্রকারী ইবাদত 'যাকাত' আদায় করবে। কেননা, যাকাত একদিকে যেমন নিজের ধন-সম্পদকে পবিত্র করে রুজিতে বরকত দান করে, অন্য দিকে তেমন আদায়কৃত যাকাতের অর্থ দিয়ে সমাজের অসহায় অনাথ ঋণগ্রস্থ মানুষের সহায়তা দান করে দারিদ্রতা বিমোচন করে একটি সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনে ভূমিকা পালন করে এবং মানুষের কাছে মানুষের যে অধিকার রয়েছে তা আদায়ের ব্যাবস্থা করে। অতএব নবীর উম্মতের মর্যাদা রক্ষার জন্য সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিরা যাকাত আদায় করবে।

তৃতীয় নির্দেশ হলো ঃ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ -আর আল্লাহকে শক্ত বা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে। অর্থাৎ আল্লাহকে অবলম্বন করবে, তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা রাখবে, সমস্ত কাজে তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে, সদাসর্বদা তাঁর উপরই নির্ভর করবে, হিদায়াত ও জীবনবিধান কেবল তাঁর নিকট হতেই গ্রহণ করবে, আনুগত্য কেবল তাঁরই করবে, কেবল তাঁকেই ভয় করে চলবে এবং আকাংখা ও কামনা-বাসনা কেবল তাঁর কাছেই করবে, কখনও তাঁকে ভুলে যাবে না।

অতঃপর আয়াতের সর্বশেষ অংশে মুসলিমদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন–

هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ তিনিই তোমাদের মাওলা - মুনিব। তিনি বড়ই উত্তম মাওলা এবং বড়ই উত্তম সাহায্যকারী।

অর্থাৎ হে মুসলিম জাতি তোমরা যাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে, তিনি কে জানো? তিনি তো হলেন সেই সত্তা, যিনি তোমাদের মাওলা-মুনিব-অভিভাবক। অর্থাৎ তিনিই তোমাদের এমন উত্তম অভিভাবক যে, তিনি তোমাদেরকে সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। তিনিই তোমাদেরকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা দান করেন। তিনিই তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে বিজয় দান করেন। তিনি সর্বোত্তম অভিভাবক। তিনি যার অভিভাবক হয়ে যান, তার আর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন হয় না। তিনি যার সাহায্যকারী হয়ে যান, তার আর কোনো সাহায্যকারী প্রয়োজন হয় না। দুনিয়ার সবাই যদি শত্রু হয়ে যায় তাতেও কোনো যায় আসে না। সবার উপরই তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান, তিনি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী।

হাদীসে কুদসীতে হযরত ওয়াহিব ইবনু অরদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে আদম সন্তান! তোমার রাগের সময় তুমি আমাকে স্মরণ করো, তাহলে আমিও আমার রাগের সময় তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। আর যাদের উপর আমার শাস্তি বর্ষিত হবে তাদের মধ্যে থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করবো, ধ্বংশ প্রাপ্তদের সাথে আমি তোমাকে ধ্বংশ করবো না। হে আদম সন্তান! যখন তোমার উপর যুলুম করা হয় তখন তুমি ধৈর্যধারণ করো, আমার দিকে দৃষ্টি দাও এবং আমার সাহায্যের উপর ভরসা রাখো ও আমার সাহায্যের উপর সন্তুষ্ট থাকো। জেনে রেখো, তুমি তোমার নিজেকে সাহায্য করবে এর চেয়ে আমিই তোমাকে সাহায্য করবো-এটাই উত্তম। (মুসনাদে ইবনু হাতিম)

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আল হজ্জের সর্বশেষ আয়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করা হলো তা থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় রয়েছে তা হলো ঃ

০ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই পারতোপক্ষে জিহাদের যাবতীয় হক আদায় করে আন্দোলন করা। অর্থাৎ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্টার জন্য নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক, শক্তি-সামর্থ সবটুকু কাজে লাগিয়ে জান-প্রাণ, ধন-সম্পদ দিয়ে সকল প্রকার প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করে অবিরাম গতীতে নীরবচ্ছিন্নভাবে ধৈর্যের সাথে আন্দোলন অব্যাহত রাখা।

০ আল্লাহ তা'য়ালা যে তার দ্বীনের জন্য আমাদেরকে বাছাই করে নিয়ে মহা সম্মানিত করেছেন, সে জন্য তাঁর নি'য়ামত আদায় করার লক্ষ্যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত থাকা এবং দ্বীনের যাবতীয় হুকুম-আহকাম, বিধি-বিধান মেনে চলা।

০ দ্বীনের বিষয়ে যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের উপর কোনো প্রকার সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেন নাই, সেহেতু নিজেরা ফতোয়া দিয়ে পূর্বের উম্মতের পাদ্রী এবং যাযকদের মতো দ্বীনকে মানুষের নিকট অগ্রহণীয় করে না তোলা বরং দ্বীনের বিধি-বিধানের মধ্য থেকে দুনিয়ার যাবতীয় উপায়-উপকরণ এবং প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অতিউত্তম ও মধ্যম পন্থী মুসলিম জাতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া।

www.icsbook.info

০ জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মিল্লাত তথা মুসলিম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকা। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা পূর্ব থেকেই আল্লাহর আনুগত্যকারীদের নাম মুসলিম রেখেছিলেন। আর আমাদের এই আল কুরআনেও মুসলিম নামকরণ করেছেন। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে থেকেই তার বিধি-নিষেধ মেনে চলা।

০ যদি আমরা আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তার দ্বীনের যাবতীয় বিধি-নিষেধকে মেনে চলতে পারি এবং মৌখিক ও বাস্তব জীবনে কাজের মাধ্যমে স্বাক্ষ্য দিতে পারি, তাহলে রাসূল (সঃ) হবেন আমাদের জন্য স্বাক্ষী আর আমরাও হতে পারবো গোটা মানব জাতির জন্য স্বাক্ষী।

০ মুসলিম জাতি হিসেবে পরিচয় দানকারী প্রথম যে মৌলিক ইবাদত নামায তা যথাযথ নিয়ম-কানুন মেনে পূর্ণভাবে আদায় করা এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা।

০ মুসলিম জাতি হিসেবে অর্থ-সম্পদকে পবিত্রকারী এবং দারিদ্রতা বিমোচনকারী মৌলিক যে ইবাদত যাকাত আদায় করা।

০ আল্লাহকে মজবুতভাবে ধারণ করা। অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে তাঁর উপরই ভরসা করা, তাকেই সাহায্যকারী বনানো, তার উপরই আশা-ভরসা রাখা, তাকেই আশ্রয়দানকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে মোকাবেলাকারী বানানো, মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক তাকেই বানানো, তারই হেদায়াত মতো চলা, তার বিধি-বিধানকে সকল ক্ষেত্রে মান্য করা। অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে তাকেই উত্তম অভিভাবক বানানো।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা হজ্জের সর্বশেষ আয়াতের দারস পেশ করতে যেসব তথ্য, তত্ত্ব, ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করা হলো, এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ত্রুটি এবং বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমরা যেসব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন সকলেই বাস্তব জীবনে আ'মল করে আখিরাতের চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভ করতে পারি, আল্লাহর কাছে সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। অয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

www.icsbook.info

শেষ রাতের নামায ও কুরআন তিলাওয়াত তাক্ওয়ার জন্য খুব বেশী ফলদায়ক

সূরা মুয্যাম্মিল ১ - ১৩ আয়াত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْـًٔا وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۝ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ۝ اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۝ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۝

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১) হে চাঁদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী! (২) রাত্রিতে দাঁড়িয়ে যান কিছু অংশ বাদ দিয়ে। (৩) অর্ধরাত্রি অথবা তার চেয়েও কিছু কম (৪) অথবা তার চেয়েও কিছু বেশী এবং কুরআন তিলাওয়াত করুন থেমে থেমে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। (৫) আমি আপনার উপর নাযিল করবো এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী। (৬) প্রকৃতপক্ষে (ইবাদাতের জন্যে) রাতে উঠা প্রবৃত্তি দমনে খুবই সহায়ক এবং কুরআন যথাযথ ভাবে পড়ার জন্য অনুকূল। (৭) দিনের বেলায় তো আপনার খুব কর্মব্যস্ততা।

www.icsbook.info

(৮) সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন এবং সবকিছু হতে বিচ্ছন্ন হয়ে একমাত্র তার জন্যই হয়ে যান। (৯) তিনি তো পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মালিক-অধিকর্তা। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। কাজেই তাকেই উকিল (অভিভাবক) বানিয়ে নিন। (১০) আর কাফির লোকেরা যেসব কথা-বার্তা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে তার জন্য আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সৌজন্যতার সাথে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। (১১) আর এসব বিত্তশালী বিলাসী মিথ্যাচারী লোকদের বুঝা-পড়ার কাজটি আমার উপর ছেড়ে দিন। আর কিছু সময়ের জন্য এসব লোকদেরকে এই অবস্থার উপরই থাকতে দিন। (১২) (এদের জন্য) আমার কাছে আছে শিকল (বেড়ী) ও দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন (১৩) আর আছে গলায় আটকিয়ে যাওয়া খাদ্য এবং কঠিন পীড়াদায়ক আযাব।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا -হে/ ওহে। الْمُزَّمِّلُ -বস্ত্রাবৃত/চাঁদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী। قُمْ -উঠুন। لَيْلَ -রাতে। اِلَّا -ব্যতীত/ছাড়া। قَلِيْلًا -কিছু অংশ। نِصْفَهُ -তার অর্ধেক। اَوْ -বা/অথবা। اِنْقُصْ -কম করুন। مِنْهُ -তা থেকে। قَلِيْلًا -সামান্য। زِدْ -বাড়ান। عَلَيْهِ -তার উপর। وَ -এবং। رَتِّلْ -ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করুন। تَرْتِيْلًا -স্পষ্টভাবে/ধীরে ধীরে/সুন্দরভাবে। اِنَّا - আমরা নিশ্চয়। سَنُلْقِىْ - শিঘ্রই অর্পণ করবো। عَلَيْكَ -আপনার উপর। قَوْلًا -বাণী/বার্তা। ثَقِيْلًا -ভারী। اِنَّ -নিশ্চয়। نَاشِئَةَ -উত্থান/শয্যাত্যাগ। الَّيْلِ -রাত্রিকালের। هِىَ -তা। اَشَدُّ -প্রবলতর। وَطْأً -প্রবৃত্তি দলনে। اَقْوَمُ -সঠিকতর/খুবই সহজতর। قِيْلًا -বাক্যস্ফুরণে। لَكَ -আপনার জন্যে। فِى النَّهَارِ -দিনের মধ্যে/বেলায়। سَبْحًا -ব্যস্ততা। طَوِيْلًا -দীর্ঘ। وَاذْكُرْ -এবং স্মরণ করুন। اِسْمَ -নাম। رَبِّكَ -আপনার মা'বুদের/প্রতিপালকের। تَبَتَّلْ -সবকিছু থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে। اِلَيْهِ -তার দিকে/জন্য। تَبْتِيْلًا -হয়ে যান। رَبُّ -প্রতিপালক/অধিকর্তা। اَلْمَشْرِقِ -পূর্বদিগন্ত। وَالْمَغْرِبِ -পশ্চিম দিগন্ত। لَا اِلٰهَ -কোন ইলাহ/মা'বুদ নেই। هُوَ -তিনি। فَاتَّخِذْهُ -অতএব তাকে গ্রহন করুন/বানিয়ে নিন। وَكِيْلًا -উকিল/ কর্মবিধায়ক। وَاصْبِرْ -

এবং আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন। عَلٰى -উপর/বিষয়ে/ব্যাপারে। مَا -যা। يَقُوْلُوْنَ -তারা (কাফিররা) কথাবার্তা বলে। وَاهْجُرْهُمْ -এবং তাদেরকে পরিহার করুন। هَجْرًا جَمِيْلًا - উত্তম পরিহার। ذَرْنِى- আমার উপর ছেড়ে দিন। الْمُكَذِّبِيْنَ-মিথ্যাচারী/মিথ্যাবাদী লোকদেরকে। اُولِى النَّعْمَةِ -বিত্তশালী, বিলাসী। مَهِّلْهُمْ -তাদেরকে এই অবস্থায় থাকতে দিন। قَلِيْلًا -কিছু সময়ের জন্য। لَدَيْنَا -আমার কাছে আছে। اَنْكَالًا -শিকল/বেড়ী। جَحِيْمًا -জলন্ত আগুন। طَعَامًا -খাদ্য/খাবার। ذَا غُصَّةٍ -গলায় আটকিয়ে যাওয়া। عَذَابًا -আযাব/শাস্তি। اَلِيْمًا - কষ্টদায়ক/কঠিন পীড়াদায়ক।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার ভাইয়েরা/বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে সূরা মুয্যাম্মিল এর ১ থেকে ১৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সহীহ্ সালামতে এবং সঠিকভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লাবিল্লাহ"।

সূরার নামকরণ ঃ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত اَلْمُزَّمِّلُ শব্দটিকেই সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আল কুরআনের অন্যান্য সূরার ন্যায়ও এই সূরাটি প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা, এই সূরার নামের সাথে বিষয়বস্তুর তেমন কোন মিল নেই। সুতরাং এই সূরাটির নাম কোন শিরোনাম হিসেবে নামকরণ করা হয়নি।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সূরাটির দু'টি রুকু। দু'টি রুকুই পৃথক পৃথক সময়ে নাযিল হয়েছে।

প্রথম রুকুর আয়াতগুলো সর্বসম্মতভাবে মাক্কী। কেননা, এর বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন হাদীস থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে মাক্কী জীবনের কোন্ সময় এটা নাযিল হয় তা হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু আলোচনা করলে কোন্ সময় নাযিল হয়েছে তা প্রমাণের সাহায্য পাওয়া যায়। যেমন—

www.icsbook.info

প্রথমত ঃ এতে নবী করীম (সঃ) কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি রাত্রিকালে বিছানা ত্যাগ করে উঠুন এবং আল্লাহর ইবাদাতে মনোনিবেশ করুন। তাহলে আপনার উপর নবুওতের বিরাট বোঝা বহন এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। এ থেকেই জানা যায় যে, নবী করীম (সঃ) এর নবুয়তী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে এই নির্দেশ নাযিল হয়েছিলো। কেননা, এই প্রাথমিক পর্যায়ে নবুয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য রাসূলে কারীম (সঃ) কে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিলো।

দ্বিতীয়ত ঃ এতে তাহাজ্জুদ নামাযে অর্ধেক রাত পর্যন্ত কিম্বা তা থেকে কিছুটা কম বা বেশী সময় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই নির্দেশ থেকে এটাই জানা যায় যে, এই রুকুর আয়াত কয়টি যখন অবতীর্ণ হয়েছিলো, তখন কুরআন মজীদের অন্তত এতোটা অংশ অবতীর্ণ হয়েছিলো যা দীর্ঘ সময় ধরে তিলাওয়াত করা যায়।

তৃতীয়ত ঃ এই আয়াতসমূহে খোদাদ্রোহী শক্তির সকল প্রকার বাধা এবং অত্যাচারমূলক আচরণের মোকাবেলার জন্য নবী করীম (সঃ) কে চরম ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া হয়েছে। আর সেই সঙ্গে মক্কার কাফিরদেরকে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এই সূরার প্রথম রুকুর আয়াতসমূহ তখন অবতীর্ণ হয় যখন নবী করীম (সঃ) প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন, ফলে মক্কায় তাঁর বিরোধিতাও প্রবলভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

দ্বিতীয় রুকুর আয়াতসমূহ নাযিলের ব্যাপারে অনেক তাফসীরকারকই একমত পোষণ করেছেন যে, এই রুকুটিও মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু অপর কয়েকজন তাফসীরকারক মত দিয়েছেন যে, উহা মাদানী জীবনে অবতীর্ণ। আর আয়াতগুলোর মূল বিষয়বস্তু থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা, এই আয়াতসমূহে আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ করার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মক্কায় এই যুদ্ধের কোন প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া আয়াতগুলোতে ফরজ যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এই ব্যাপারে সবাই একমত যে, যাকাতের নির্দিষ্ট হার এবং নিছাবের পরিমান মাদানী জীবনেই ফরয হয়েছিলো। (আল্লাহই ভাল জানেন)

সূরার বিষয়বস্তু ঃ সূরার প্রথম সাতটি আয়াতে নবী করীম (সঃ) কে নির্দেশ

দেয়া হয়েছে যে, নবুয়াতের যে বিরাট কাজের বোঝা আপনার উপর অর্পণ করা হয়েছে সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য আপনি নিজেকে প্রস্তুত করুন। আর নিজের প্রবৃত্তিকে প্রস্তুত করার কর্মসূচী হিসেবে আপনি অর্ধেক রাত্রি বা তার চেয়ে কিছুটা কম বা বেশী সময় ধরে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করুন।

সূরার ৮ হতে ১৪ নম্বর আয়াতসমূহে নবী করীম (সঃ) কে সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র মুনিব-মাওলা আল্লাহর জন্য অনুগত হয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর হে নবী, নিজের বিষয়গুলো আল্লাহর উপর ন্যাস্ত করে আপনি নিশ্চিত থাকুন। বিরোধিরা যা কি করে এবং যা কিছু বলে তার জন্য আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং তাদেরকে মোকাবেলা করার বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন।

সূরার ১৫ থেকে ১৯ নম্বর আয়াতসমূহে বিরুদ্ধবাদী মক্কার কাফিরদের সাবধান করে দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, আমি তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছি। যেমন করেফিরাউনের প্রতিও রাসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর লক্ষ্য করো-ফিরাউন যখন আল্লাহর রাসূলকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করলো, তখন সে করুন পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলো। অতএব তোমরা যদি রাসূলের সাথে অনুরূপ আচরন করো তাহলে তোমাদের পরিণতিও অনুরূপ হতে পারে। আর যদি দুনিয়ায় নাও হয়, তবে আখিরাতের পরিণতি থেকে কিভাবে উদ্ধার পাবে? কেউ তোমাদেরকে তোমাদের পাপের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরার প্রথম রুকুর আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু আলোচনা করা হলো। অতঃপর দ্বিতীয় রুকু অবতীর্ণ হয় প্রথম রুকুর প্রায় দশ বছর পরে। এ ধরণের বর্ণনা হযরত সায়ীদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। প্রথম রুকুতে বলা 'তাহাজ্জুদ' নামাযটি এই রুকুতে অনেকটা হালকা ও সহজ সাধ্য করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে তাহাজ্জুদ নামায যতটা সহজে আদায় করা যায়, সেই চেষ্টায় করবে। কিন্তু মুসলিম সমাজ সর্বত্র সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করবে ফরজ নামাযে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পূর্ণ সতর্কতা ও সুষ্ঠতার সাথে আদায় করবে। ফরজ যাকাত যথা নিয়মে আদায় করবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের ধন-সম্পদ খরচ করতে থাকবে।

www.icsbook.info

সূরার শেষ অংশে মুসলমানদের উপদেশ দিয়ে বলা হচ্ছে, দুনিয়ায় তোমরা যে ভালো ভালো কাজ করো তা কখনই নষ্ট ও নিস্ফল হবে না। তোমরা দুনিয়াতে থাকতেই যেই সম্পদ অগ্রীম পাঠিয়ে দিয়েছো তা তোমরা আল্লাহর নিকট পৌছিয়ে ঠিকঠাক এবং যথাযথ ভাবেই মৌজুদ পেয়ে যাবে। এই অগ্রীম পাঠানো সামগ্রী-সরঞ্জাম তোমাদের দুনিয়ায় রেখে যাওয়া দ্রব্য-সামগ্রীর তুলনায় অধিক উত্তমই নহে বরং আল্লাহর নিকট তোমরা তোমাদের পাঠানো আসল সম্পদ হতে অনেক বেশী বেশী প্রতিদান পাবে।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরাটির ব্যাখ্যা সহজভাবে অনুধাবন করার জন্য প্রাথমিক অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো। এখন আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা ধারাবাহিকভাবে পেশ করছি। সূরার প্রথমেই নবীজীকে নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ **ওহে চাঁদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী।**

আয়াতের প্রথমেই يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ (হে রাসূল) বা يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ (হে নবী) না বলে يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলে সম্বোধন করে ডাকার পেছনে কয়েকটি কারণ হতে পারে। যেমন-

এক. এভাবে সম্বোধন করার পেছনে এক প্রকারের করুণা এবং অনুগ্রহ আছে। করুণা প্রকাশার্থে স্নেহ ও ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে সাময়িক অবস্থার দ্বারাও কাউকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। (রুহুল মা'আনী)

দুই. মন খরাপ করে চাঁদর মুড়ী দিয়ে থাকা অবস্থায় তাঁকে এভাবেই কোনো কাজের নির্দেশ দেয়ার জন্য সম্বোধন করে থাকতে পারেন। যেমন-

ইবনে কাসীরে একটি বর্ণনা রয়েছে- মুসনাদে বায্যারে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশের মুশরিকরা তাদের সম্মেলন কেন্দ্র "দারুন নদুআতে" একত্রিত হয়ে পরস্পর বলাবলি করলো যে, এসো আমরা এই লোকের (মুহাম্মদের) এমন একটি নাম ঠিক করি যাতে সবার মুখ দিয়ে একই নাম শুনা যায়। তখন কেউ কেউ বললো- তার নাম 'কাহিন' (গণক) রাখা হোক। একথা শুনে অন্যরা বললো, প্রকৃতপক্ষে সেতো কাহিন (গণক) নয়। তখন অন্য একটি প্রস্তাব উঠলো যে, তাহলে

তার নাম 'মাজনুন' (পাগল) রাখা হোক। এই প্রস্তাবের উপরেও অন্যরা আপত্তি তুললো যে, সেতো মাজনুন (পাগল) নয়। এরপর প্রস্তাব করা হলো যে, তাহলে তার নাম 'সাহির' (যাদুকর) রাখা হোক। কিন্তু এ প্রস্তাবও প্রত্যাখান হলো এবং বলা হলো যে, সেতো সাহিরও (যাদুকর) নয়। মোট কথা তারা তাঁর তেমন এমন কোন খারাপ নাম ঠিক করতে পারলো না যাতে সবাই একমত হতে পারে। এভাবেই ঐ মজলিশ (সভা) ভেঙ্গে গেল। তাদের একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) চাঁদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় হযরত জিবরীল আমীন তাঁর নিকট আসলেন এবং يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলে সম্বোধন করলেন। (ইবনে কাসীর)

তিন. একথা দিয়ে এও হতে পারে যে, তিনি (সঃ) স্বাভাবিক ভাবেই চাঁদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে এ অবস্থায় ডাকতে গিয়ে 'হে নবী' বা 'হে রাসূল' না বলে 'হে চাঁদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী' বলে সম্বোধনের পেছনে একটি সুক্ষ্ণ তাৎপর্য আছে। এতে বুঝা যায় যে, চাদর মুড়ি দিয়ে আরামে পা ছাড়িয়ে দিয়ে শুয়ে থাকার সময় শেষ হয়ে গেছে, এখন তাঁর উপর একটি বিশেষ কাজের দ্বায়িত্ব অর্পিত হচ্ছে যা অন্য রকমের এবং পূর্বাপেক্ষা ভিন্নতর। (তাফহীমূল কুরআন)

চার. 'হে চাদর দিয়ে আবৃত' কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এও হতে পারে যে, "হে কুরআনকে উত্তমভাবে গ্রহণকারী"। কেননা, রাসূল (সঃ)-ই একমাত্র কুরআনকে উত্তমভাবে আঁকড়ে ধরতে পারেন, আর কেউ নয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ (আল্লাহই ভাল জানেন)

নবী করীম (সঃ) কে এভাবে সম্বোধন বা ডাকার পর মহান আল্লাহ পরবর্তী আয়াতে নির্দেশ দিয়ে বলেন-

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا **-রাত্রিতে (নামাযের জন্য) দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে।**

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মহানবী (সঃ) কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, হে নবী (সঃ) আপনি রাত্রিকালে চাদর মুড়ি দিয়ে শয়ন করা ত্যাগ করে উঠুন এবং তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যান। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

"তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের রবের ডাকে আশায় ও আশংকায়, আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা হতে তারা খরচ করে।"

(সূরা সাজদা- ১৬)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) সারা জীবন এই নির্দেশ পালন করে গেছেন।

إِلَّا قَلِيلًا -**কিছু অংশ বাদ দিয়ে।** এ কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হলো- হে নবী (সঃ) রাত্রিটা নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিন। আর উহার কম অংশ ঘুমানোর কাজে ব্যয় করুন। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো- সারা রাতটাই নামাযে কাটিয়ে দিন- হে নবী এমন কথা আপনাকে বলা হচ্ছে না। বরং সেই সঙ্গে আপনি বিশ্রামও করুন।

অবশ্য অন্য আয়াতে প্রথম অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন- আল্লাহ বলেন- وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا

"রাতের বেলা আল্লাহর সামনে সিজদাবত হয়ে থাকুন এবং রাতে দীর্ঘ সময় তাঁর তাস্‌বীহ্‌ করে কাটিয়ে দিন।" (সূরা দহর- ২৬)

তাহাজ্জুদের নামায রাসূল (সঃ) এর জন্য কি ফরয ছিলো ঃ

ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, তাহাজ্জুদের নামায রাসূল (সঃ) এর জন্য ফরজ ছিলো এবং উম্মতের জন্য ওয়াজিব নয়। যেমন তিনি নিম্নের আয়াত উল্লেখ করেন- وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدً

"আর আপনি রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ কায়েম করুন। এটা আপনার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় যে, আপনার রব আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।"(সূরা বনি ইসরাঈল-৭৯)

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ) তাফসীরে মা'রিফুল কুরআনে উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য আয়াতগুলো কুরআন নাযিলের প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছে। তখনও পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হয়নি। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মি'রাজের রাতে ফরজ হয়।

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) প্রমুখের হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম বগভী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের আলোকে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ রাতের নামায রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও সমস্ত উম্মতের উপর ফরজ ছিলো। এই নির্দেশ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হবার পূর্বের কথা।

www.icsbook.info

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের নামায শুধু ফরজই করা হয়নি; বরং তাতে এক চতুর্থাংশ সময় মশগুল থাকাও ফরয করা হয়েছে। কারণ, আয়াতের মূল নির্দেশ হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকা।

ইমাম বগভী (রহঃ) বলেন, এই হুকুম পালন করতে যেয়ে, রাসূল (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম রাতের অধিকাংশ সময় তাহাজ্জুদ নামাযে ব্যয় করতেন। ফলে তাদের পা দু'টি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফুলে যেত এবং হুকুমটি বেশ কষ্টকর হয়। এক বছর পর এই সূরার শেষাংস –

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ নাযিল হলে দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে বলা হয় যে, যতক্ষণ নামায পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামায পড়াই তাহাজ্জুদের জন্য যথেষ্ট। এই বিষয়বস্তু আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, মি'রাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হওয়ার হুকুম অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদের (ফরযের) আদেশ রহিত হয়ে যায়। তবে এর পরেও তাহাজ্জুদ সুন্নত থেকে যায়। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। (তাফসীরে মাযহারী)

হাদীসে পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধের সফরেও তাহাজ্জুদের নামায বাদ দিতেন না, এমন কি সওয়ারীর উপরও এই নামায আদায় করতেন। মা আয়িশার বর্ণিত হাদীসে আরও পাওয়া যায়, ঘুম অথবা দুঃখ কষ্ট কিম্বা রোগের কারণে রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতে না পারলে দিনের বেলায় তিনি তা বার রাকায়াত আদায় করে নিতেন। (সহীহ মুসলিম) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) জীবদ্দশায় কোন রাতই তাহাজ্জুদ নামায পড়া বাদ দেন নাই।

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা পরবর্তী আয়াতে রাত্রি কতটুকু তাহাজ্জুদে অতিবাহিত করতে হবে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন–

نِصْفَهٗ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ○ اَوْزِدْ عَلَيْهِ

অর্ধরাত্রি বা তার চেয়েও কিছু কম অথবা তার চেয়েও কিছু বেশী নামাযে মশগুল হোন।

إِلَّا قَلِيلًا -ব্যতিক্রমধর্মী বর্ণনা। তাই প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, অর্ধেক রাত্রি তো কিছু অংশ হতে পারে না? উত্তর এই যে, রাতের প্রথম অংশ তো মাগরীব ও ঈশা নামাযে অতিবাহিত হয়ে যায়। এখন অর্ধেকের অর্থ হবে বাকী রাতের অর্ধেক। সেটা সারা রাতের তুলনায় কিছু অংশ। এই আয়াতে অর্ধরাতের কমেরও অনুমতি আছে আবার বেশীরও অনুমতি আছে। তাই সামষ্টিকভাবে বিশ্লেষণ করলে সারমর্ম এই হয় যে, কমপক্ষে রাতের এক চতুর্থাংশ বা চার ভাগের এক ভাগের চেয়ে কিছু বেশী সময় নামাযে মশগুল থাকা। বেশীটুকু নিজের এখতিয়ারের উপর নির্ভর করে।

অতঃপর আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি শিখিয়ে বলেন- وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

আর কুরআন পাঠ করুন থেমে থেমে স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে।

تَرْتِيلًا -এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যেমন- ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ভাবে, সুন্দর ভাবে, অনুধাবন করে ইত্যাদি। অর্থাৎ দ্রুততার সাথে খুব তাড়াতাড়ি না পড়া, যেভাবে আমাদের সমাজের অধিকাংশ কুরআনে হাফিজ সাহেবানরা পাঠ করে থাকেন। বরং ধীরে ধীরে পাঠ করা, এক একটি শব্দ মুখে উচ্চারণ করা এবং প্রতিটি আয়াতে থামা। যেন আল্লাহর কালামের অর্থ ও তাৎপর্য পূর্ণমাত্রায় তিলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারীর হৃদয়ঙ্গম হয়, উহার বিষয়বস্তু মনের মধ্যে গেঁথে যায় এবং মন উহা গ্রহণে প্রভাবিত হয়। কুরআনের যে জায়গায় আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেই জায়গা তিলাওয়াত করার ফলে আল্লাহর বিরাটত্ব ও মহানত্ব পাঠকের মনে-দেলে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কোথাও হয়তো আল্লাহর রহমতের উল্লেখ রয়েছে তা তিলাওয়াত করার সাথে সাথে পাঠকের অন্তর আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে উচ্ছসিত হয়ে উঠে। যে আয়াতে আল্লাহর গযব-আযাবের উল্লেখ রয়েছে তা তিলাওয়াত করার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তিলাওয়াতকারীর অন্তরে ভয় ও আতংক-জেগে উঠে। কোথাও কোনো জায়গায় কোনো কাজের আদেশ করা হয়েছে বা কোথাও কোনো কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে, এসব আয়াত পাঠ করার সাথে সাথে হৃদয়-মন যেন তা অনুধাবন করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন হৃদয়ঙ্গম সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করতেন যে- হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একবার আমি রাতের নামায (তাহাজ্জুদে) রাসূলে করীম (সঃ) এর সাথে দাঁড়িয়ে

গেলাম। তখন দেখলাম, তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছেন এভাবে যে, যেখানে আল্লাহর তাস্‌বীহ্‌ করা হয়েছে, সেখানে তিনি তাস্‌বীহ্‌ পাঠ করছেন। যেখানে দোয়া করার সুযোগ আসতো সেখানে তিনি দোয়া করছেন। যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণের বিষয় হতো, সেখানে তাঁর নিকট তিনি পানাহ চাইতেন।" (সহীহ মুসলিম, নাসায়ী)

হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে আরো একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সঃ) একবার রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে যখন তিনি–

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"হে আল্লাহ! তুমি যদি তাদের আযাব দাও, তবে (তুমি তা দিতে পারো) তারা তো তোমারই বান্দাহ মাত্র। আর তুমি যদি তাদের ক্ষমা করে দাও, তবে (তা করারও তোমার ক্ষমতা আছে) তুমি তা করতে পারো। কেননা, তুমি তো প্রতাপশালী ও মহাবিজ্ঞানী।" আয়াত পর্যন্ত পৌছলেন, তখন তিনি (তাতে এতই অভিভুত হয়ে গেলেন যে) এই আয়াতটি বারবার পাঠ করতে লাগলেন। আর এভাবেই ভোর হয়ে গেল।

(সহীহ বুখারী, মুসনাদে আহমাদ)

রাসূল (সঃ) এর কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি ঃ

নবী করীম (সঃ) কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত বা পাঠ করতেন তা হযরত আনাস (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি (সঃ) প্রতিটি শব্দ টেনে টেনে দীর্ঘ করে পড়তেন। তিনি উদাহরণ হিসেবে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ার কথা উল্লেখ করে বললেন যে, তাতে তিনি (সঃ) اَللّٰهُ - رَحْمٰنِ - رَحِيْمِ এই শব্দগুলি খুব বেশী টেনে টেনে পড়তেন। (সহীহ বুখারী)

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) কে অনুরূপ প্রশ্ন করা হলে তিনিও বললেন, "রাসূলে করীম (সঃ) এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পাঠ করতেন এবং প্রত্যেকটি আয়াত পাঠ করে থেমে যেতেন। যেমন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়ে থামতেন। তারপর اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে থামতেন। তারপর পড়তেন– مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ"

(মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

www.icsbook.info

অপর একটি বর্ণনায় হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেছেন, "নবী করীম (সঃ) কুরআনের এক একটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে পাঠ করতেন।"

(তিরমিযী, নাসায়ী)

সুন্দর লিহান বা সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা ঃ

ترتيل এর একটি অর্থ হলো, খুব সুন্দর ও মিষ্টি সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কুরআনকে নিজের সুর দ্বারা সৌন্দর্য মন্ডিত করো এবং ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে মিষ্টি সুরে কুরআন তিলাওয়াত বা পাঠ করে না। আর হযরত আবু মুসা আল আশআরী (রাঃ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর এ মন্তব্য করা যে, "তাকে হযরত দাউদ (আঃ) এর বংশধরের মধুর সুর দান করা হয়েছে" এবং হযরত মুসা (আঃ) এর এ কথা বলা, "আমি যদি জানতাম যে, (হে নবী সঃ) আপনি আমার কুরআন তিলাওয়াত শুনেছেন তাহলে আমি আরও উত্তম ও মধুর সুরে পড়তাম।"

কুরআন তিলাওয়াত খুব দ্রুত এবং কবিতার মতো পাঠ না করা ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, তোমরা বালুকার মতো কুরআনকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিও না এবং কবিতার মতো কুরআনকে অভদ্রতার সাথে পাঠ করো না। এর চমৎকারিত্বের প্রতি খেয়াল রেখো এবং অন্তরে তা অনুধাবন করো। আর সূরা তাড়াতাড়ি শেষ করার পেছনে লেগে পড়ো না।"

(ইবনে কাসীর। ইমাম বগভী রহঃ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

একবার এক লোক এসে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে বললো যে, আমি মুফাস্সালের সমস্ত সূরা আজ রাতে একই রাকায়াতে পাঠ করে ফেলেছি। তার একথা শুনে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাকে বললেন, তা হলে সম্ভবতঃ তুমি কবিতার মতো তাড়াতাড়ি করে পাঠ করে থাকবে। ঐ সূরাগুলো আমার বেশ মুখস্ত আছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিলিয়ে পড়তেন। তারপর তিনি মুফাস্সাল সূরাগুলোর মধ্য থেকে বিশিষ্ট সূরার নাম লিখেন যেগুলোর দু'টি করে সূরা মিলিত করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক এক রাকায়াতে পাঠ করতেন। (ইবনে কাসীর)

আফসোস! আমাদের সমাজের ইমাম সাহেবানরা বিশেষ করে হাফিযে কুরআন"এরা রমযানে "খতমে তারাবীর" নামে কি করছেন ? তারা কি

www.icsbook.info

কুরআনকেই খতম করে দিচ্ছেন না? নেকী লাভের পরিবর্তে গোনাহ কামাই করছেন না? আল্লাহ ঐ সমস্ত অবুঝ ভাইদেরকে বুঝ দান করুন। আমীন।

কুরআন ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে পাঠকারীর মর্যাদা ঃ

যারা কুরআনকে تَرتِيل এর সাথে নবী করীম (সঃ) এর পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠ করেন, তাদের সম্পর্কে হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কুরআনের পাঠককে কিয়ামতের দিন বলা হবেঃ পড়তে থাকো এবং ধীরে ধীরে ও স্পষ্টভাবে পড়তে থাকো যেভাবে দুনিয়ায় তুমি পাঠ করতে। তোমার মনযিল ও মরতবা বা মর্যাদা হলো ওটা যেখানে তোমার আখিরী আয়াত শেষ হয়।" (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমাদের কিরাত বা কুরআন তিলাওয়াত কেমন হওয়া উচিত তা আমরা উপরের বর্ণনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আ'মল করতে পারি। আর যদি আমরা অশুদ্ধভাবে আয়াতে আয়াতে না থেমে দ্রুততার সাথে কবিতার মতো আউড়িয়ে অন্তরে ছোয়া না লাগিয়ে বুলবুলি পাখীর মতো না বুঝে পড়ি, তাহলে আমাদের জীবনে কুরআনের যেমন প্রভাব পড়বে না তেমনি গোনাহর পাল্লাহও হবে ভারী। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ মহানবী (সঃ) কে এক অতি মহান দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন- إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا **নিশ্চয় আমি আপনার উপর নাযিল করবো এক গুরুত্বপূর্ণ (ভারী) বাণী।**

এখানে قَوْلًا ثَقِيلًا 'ভারী ও দুর্বহ বাণী' বলতে আল কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। আল কুরআন এমনই এক ভারী ও দুর্বহ বাণী যা একমাত্র আল্লাহর নবীর পক্ষেই বহন করা সম্ভব। আর অন্য কোন সৃষ্টির পক্ষেই বহন করা সম্ভব নয়। যেমন মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে সূরা হাশরে উল্লেখ করে বলেন-

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ -

"যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তাহলে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিণীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে করে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা হাশর-২১)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আল কুরআনের গুরুভার বহন করা কোন জ্যান্ত প্রাণী কেন কোন নির্জীব পাথর বা মাটির পাহাড়ের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়বে যা তার ভারে নূয়ে পড়বে এবং আল্লাহর ভয়ে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়বে।

قَوْلًا ثَقِيلًا এর কয়েকটি তাৎপর্য হতে পারে। যেমন–

প্রথমত ঃ হে নবী (সঃ) রাতের বেলায় নামায আদায়ের নির্দেশ আপনাকে এজন্য দেয়া হচ্ছে যে, আমি আপনার উপর এমন এক ভারী ও দুর্বহ বাণী নাযিল করতে যাচ্ছি যার গুরুভার বা বোঝা বহনের শক্তি আপনার মধ্যে সৃষ্টি ও সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। আর এই শক্তি আপনার মধ্যে অর্জিত এভাবে হতে পারে যদি আপনি রাতের বিশ্রাম ত্যাগ করে উঠে পড়েন এবং নামাযে দাঁড়িয়ে যান এবং রাতের অর্ধেক বা তার চেয়ে কিছু বেশী বা কিছু কম সময় ধরে ইবাদতে অতিবাহিত করেন।

দ্বিতীয়ত ঃ কুরআন মজীদকে ভারী দুর্বহ বোঝা বলা হয়েছে এ কারণে যে, উহার বিধি বিধান পালন করা। উহার শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে বাস্তব রূপ দেখিয়ে দেয়া, উহার দাওয়াত নিয়ে সারা বিশ্বের দরবারে বাধাসত্ত্বেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যাওয়া। তাতে বর্ণিত আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা, নিতি-নৈতিকতা, আচার-আচরণ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচলিত সকল ব্যবস্থাপনার উপর বিপ্লব সৃষ্টি করা এমন এক মহা সাধনা, যার চেয়ে বড় এবং দুঃসাধ্য কাজ কল্পনাও করা যায় না।

তৃতীয়ত ঃ কুরআনকে দুঃসাধ্য ও দুর্বহ কালাম বা বাণী বলার আরও একটি কারণ হলো, উহা নাযিলের সময়ের ভার এবং উহার বোঝা বহন করা অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন- অহী লেখক হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বর্ণনা করেন। "তিনি বলেন যে, একবার নবী করীম (সঃ) এর উপর অহী নাযিল হচ্ছিল। এই সময় তিনি তাঁর উরু আমার উরুর উপর রেখে শুয়েছিলেন। তখন আমার উরুর উপর এমন এক চাপ অনুভব করলাম

যাতে আশংকা করলাম যে, আমার উরু চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে।"
(সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "অহী নাযিলের সময় আপনি কি কিছু অনুভব করেন? রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেন, আমি এমন শব্দ শুনতে পাই যেমন কোন জিঞ্জীরের শব্দ হয়। তখন আমি নিঃশব্দ হয়ে পড়ি। যখনই অহী নাযিল হয় তখন তা আমার উপর এমন বোঝা হয় যে, যেন মনে হয় আমার প্রাণই বেরিয়ে পড়বে।" (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমি তীব্র শীত কালেও নবী করীম (সঃ) এর উপর অহী নাযিল হতে দেখেছি। সেই সময়ও তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়তো।"(সহীহ্ বুখারী-মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

অন্য এক হাদীসে হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "হযরত মুহাম্মদ (সঃ) উটের উপর আরোহী থাকা অবস্থায় তাঁর উপর অহী নাযিল হতে থাকলে উট তার বুক (ভারে) মাটির সাথে মিশিয়ে দিতো এবং অহী নাযিল সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উট বিন্দুমাত্র নড়াচড়াও করতে পারতো না।"(মুসনাদে আহমাদ, হাকেম, ইবনে জরীর)

অর্থাৎ অহীর ভারেই এমন অবস্থা হতো। অনুরূপ ভাবে তার যে হুকুম আহকাম আছে তাও পালন করা ছিলো অনুরূপ কঠিন। হযরত ইমাম ইবনে জারীর (রহঃ) এর উক্তিও এটাই।

হযরত আবদুর রহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দুনিয়াতে যেমন এটা ভারী কাজ, তেমনি আখিরাতেও এর প্রতিদান ও পুরস্কারও হবে ভারী (মূল্যবান)। (ইবনে কাসীর)

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা রাতে উঠার উপকারীতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন–

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

প্রকৃতপক্ষে (ইবাদতের জন্যে) রাতে উঠা প্রবৃত্তি দমনে খুবই সহায়ক এবং কুরআন যথাযথভাবে পড়ার জন্য অনুকুল।

نَاشِئَةَ الَّيْلِ এর তাৎপর্য উল্লেখ করে তাফসীরকার এবং ভাষাবিদগণ চারটি অর্থ করেছেন। যেমন–

www.icsbook.info

প্রথম অর্থ হলো- রাতের বেলায় বিছানা ত্যাগকারী ব্যক্তি।
দ্বিতীয় অর্থ হলো- রাত্রি কালিন সময়।
তৃতীয় অর্থ হলো- রাতের বেলায় বিছানা ত্যাগ করা।
চতুর্থ অর্থ হলো- এই শব্দটি কেবল রাতের বেলায় বিছানা ত্যাগ করে উঠাই বুঝায় না, ঘুমিয়ে উঠাও বুঝায়।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেনঃ এর অর্থ রাতে ঘুমের পর নামাযের জন্যে গাত্রোত্থান করা। তাই এর অর্থ হয়ে গেছে তাহাজ্জুদ। কারণ এর শাব্দিক অর্থও রাতে ঘুমের পর উঠে নামায পড়া। ইবনে কায়মান (রহঃ) বলেন, শেষরাতে গাত্রোত্থান করাকে نَاشِئَةَ الَّيْلِ বলা হয়।

ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন, রাতের যে অংশতে কোন নামায পড়া হয়, তা نَاشِئَةَ الَّيْلِ এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়ের (রহঃ) তাই বলেছেন। (তাফসীরে মাযহারী)

প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোনই বিরোধ নেই। রাতের যে কোন অংশে যে নামায পড়া হয় অর্থাৎ ঈশার পর যে নামায পড়া হয়, তাই- نَاشِئَةَ الَّيْلِ ও قِيَامَ الَّيْلِ এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন। তবে রাসূল (সঃ) সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনগণ সর্বদাই এই নামায ঘুমের পর শেষ রাতে উঠে পড়তেন। তাই এটাই উত্তম এবং বেশী বরকতপূর্ণ। তবে ঈশা নামাযের পর যে কোন নফল নামায পড়া যায়, তাতে তাহাজ্জুদের সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। (মা'রিফুল কুরআন)

هِيَ اَشَدُّ وَطْأً -এর অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাপক। একটি বাক্যে এর তাৎপর্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই নিম্নে কয়েকটি তাৎপর্য উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথম তাৎপর্য এ হতে পারে যে, রাতের বেলা ইবাদাতের জন্য ঘুম থেকে উঠা এবং দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের স্বভাব বিরোধী কাজ। মানুষের প্রকৃতিই হলো এই সময় বিশ্রাম গ্রহণ করা। ফলে এই অবস্থায় এ কঠিন কাজটি করা নিঃসন্দেহে কৃচ্ছসাধনার কাজ। এই কৃচ্ছসাধনা মানুষের প্রবৃত্তি দমনের ও নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য বেশ প্রভাবশালী ব্যাপার। আর যে ব্যক্তি এভাবে নিজের নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পারে এবং নিজের দেহ ও মনের উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় ও নিজের সমস্ত শক্তিকে আল্লাহর পথে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, সেই সবচেয়ে বেশী দৃঢ়তার সাথে

সত্য ও শাশ্বত দ্বীনের দাওয়াতকে দুনিয়ার বুকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় তাৎপর্য এও হতে পারে যে, মন-দিল ও মুখের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টিতে এটা একটা বড় মাধ্যম ও উপায়। কেননা, রাতের বেলায় এ সময়ে বান্দাহর এবং আল্লাহর মধ্যে তাসাউফ বা গভীর প্রেম সৃষ্টিতে কোন প্রতিবন্ধক বা আড়াল সৃষ্টিকারী কিছুই থাকে না। এই অবস্থায় বান্দাহ তার মুখ দিয়ে যা কিছুই বলে তার দিল বা হৃদয়ের গভীর কন্দরেরই কথা হয়ে থাকে।

ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন যে, রাতে নামাযের জন্য উঠা অন্তর, দৃষ্টি, কান ও জিহবার মধ্যে পারস্পরিক একাত্মতা সৃষ্টিতে খুবই কার্যকর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন أَشَدُّ وَطْئًا এর অর্থ এই যে, কান ও অন্তরের মধ্যে তখন অধিকতর একাত্মতা থাকে। কারণ, রাতের বেলায় সাধারণতঃ কাজকর্ম ও হট্টোগোল থাকে না। তখন মুখ থেকে যা উচ্চারিত হয় কানও তা শুনে এবং অন্তরেও তা উপলব্ধি করে।

তৃতীয় তাৎপর্য এ হতে পারে যে, এটা ব্যক্তির ভিতর ও বাইরের মধ্যে সঙ্গতি সৃষ্টিতে বড় কার্যকর উপায়। কেননা, রাতের বেলায় সকলের অজান্তে যে ব্যক্তি নিজের আরাম-বিরাম উপেক্ষা করে ইবাদত করার জন্য বিছানা ত্যাগ করে, সে অবশ্যই এটা একান্ত নিষ্ঠার কারণে এবং নিষ্ঠার সাথেই করবে বা করে থাকে। তার মধ্যে রিয়া বা লোক দেখানোর কোন সুযোগ থাকে না।

চতুর্থ তাৎপর্য এও হতে পারে যে, যেহেতু এই ইবাদত দিনের বেলার ইবাদতের তুলনায় অনেক কষ্টকর। তাই এই ইবাদত নিয়মিত পালন করার ফলে ব্যক্তির মধ্যে অবিচলতা, স্থিতিশীলতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণ সৃষ্টি হয়, ফলে সে আল্লাহর পথে যে কোন কাজ খুব দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে করতে পারে এবং কঠিন বিষয়গুলো খুব সহজভাবে দৃঢ়তার সাথে সমাধান করতে সক্ষম হয়।

أَقْوَمُ قِيلًا -এর أَقْوَمُ এর শাব্দিক অর্থ-অধিক সঠিক। আর قِيلًا এর অর্থ-বাণী বা কথা। অর্থাৎ أَقْوَمُ قِيلًا এর শাব্দিক অর্থ হলো-'কথাকে অধিক যথার্থ ও সঠিক বানায়'। কিন্তু এর আসল বক্তব্য হলো, এই সময়

কুরআনকে বেশী শান্তি-প্রশান্তি, নিশ্চিন্ততা এবং মনোযোগের সাথে পড়া যেতে পারে। কেননা, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি, চেঁচামেচি ও হট্টোগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিষ্ক ব্যাকুল হয়ে উঠে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই শব্দ দু'টির তাৎপর্যে বলেছেন, এই সময় কুরআন বেশী বেশী চিন্তা-গবেষণা ও মনোযোগ-মনোনিবেশের সাথে পাঠ করা যেতে পারে। (আবু দাউদ)

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা পরবর্তী আয়াতে নবিজীর দ্বিনের ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করে বলেন- إِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا

(হে নবী) দিনের বেলায় তো আপনার খুব কর্মব্যস্ততা।

নবী (সঃ) কে উল্লেখ করে অন্যান্য সবাইকে আল্লাহ পাক এই আয়াতে নির্দেশনা দিয়ে বলেন, "হে নবী (সঃ) দিনের বেলায়তো দ্বীনের দায়িত্ব পালন, নিজের ও পরিবারের কাজের ব্যস্ততা এবং সমাজের দায়িত্ব পালনে আপনাকে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়, সুতরাং রাতকে আপনি আল্লাহর ইবাদতের জন্য বাছাই করে নিন। কেননা, দিনের সমস্ত কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে নিরিবিলি একাগ্রচিত্তে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাতে প্রয়োজন মতো ঘুম ও বিশ্রাম এবং তাহাজ্জুদের নামাযও মনোনিবেশের সাথে ব্যস্ততা ছাড়াই পড়া হয়ে যায়। এই নির্দেশ আল্লাহর নবীর সাথে অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্যও প্রযোজ্য।

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন এবং সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র তাঁর জন্যই হয়ে যান।

تَبَتَّل শব্দের অর্থ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাজ্জুদের নামাযের আদেশ দেয়ার পর এই আয়াতে এমন এক ইবাদতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা রাত অথবা দিনের সাথে বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত নয়। বরং তা সর্বদা ও সকল অবস্থায় জারি থাকে। আর তা হলো, আল্লাহর যিকির বা আল্লাহকে স্মরণ করা।

এখানে সদাসর্বদা অব্যাহত রাখার অর্থে আল্লাহকে স্মরণ রাখার আদেশ করা হয়েছে। কেননা, এ কথা কল্পনাও করা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)

www.icsbook.info

আল্লাহকে স্মরণ করতেন না, তাই এই আদেশ করা হয়েছে। (মাযহারী) বরং আয়াতের উদ্দেশ্য হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে দিনরাত সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এতে কোন সময় অবহেলা ও অসাবধনতাকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। এখানে স্মরণ করাকে ব্যাপক অর্থে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুখে এবং অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করা অথবা দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গকে আল্লাহর আদেশ পালনে সর্বদা নিয়োজিত রাখা। অর্থাৎ যে কোন প্রকারে আল্লাহকে স্মরণ করা।

হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়। তিনি বলেন- كَانَ يَذْكُرُاللهَ عَلٰى كُلِّ حِيْنٍ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ) সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করতেন। তবে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পায়খানা প্রস্রাবের সময় মুখে আল্লাহকে স্মরণ করতেন না। তবে তিনি মুখে আল্লাহকে স্মরণ না করলেও অন্তরে স্মরণ রাখতেন।

অন্তরে স্মরণ দু'প্রকার- (১) শব্দ কল্পনা করে স্মরণ করা। (২) আল্লাহর গুণাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। (মাওলানা থানভী রহঃ)

আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় নির্দেশ হলো- وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

(হে নবী) আপনি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র তাঁর জন্যেই হয়ে যান।

অর্থাৎ হে নবী সঃ! আপনি সমগ্র সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশায় ইবাদতে মগ্ন হয়ে যান। সাধারণ অর্থে বলা যায়- ইবাদতের মধ্যে শিরক না করা, নিজের সমস্ত কর্মকান্ড তথা উঠাবসা, চলাফেরায় আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখা। অন্যকে লাভ-লোকসান ও বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করা।

হযরত ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন- تَبَتَّلْ এর অর্থ দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহর নিকট যা আছে, তার প্রতি মনোনিবেশ করা। (মাযহারী)

তবে এই تَبَتَّلْ তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সেই رَهْبَانِيَّةٌ তথা বৈরাগ্যবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন যা কুরআনে নিন্দা করা হয়েছে এবং হাদীসে- لَارَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ "ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নেই" বলে প্রত্যাখান করা হয়েছে।

www.icsbook.info

এখানে تَبَتَّلْ বা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কছেদ বলতে বিশ্বাসগত ভাবে বা কাজেকর্মে আল্লাহর সম্পর্কের উপর কোন সৃষ্টির সম্পর্ককে প্রবল না করা। আর এ ধরনের সম্পর্কছেদ-বিবাহ-সাদী, আত্মীয়তা, যাবতীয় সাংসারিক কাজকর্ম এবং সামাজিক কাজকর্মের সাথে জড়িত থেকেই করা সম্ভব। আর নবী (সঃ) এর আচার-আচরণ ও সমগ্র কর্মজীবন এর সাক্ষ্য বহন করে। তিনিই আল্লাহ এবং দুনিয়ার সাথে সমন্বয়কারী হিসেবে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। সুতরাং আমাদের জন্য এখানে শিক্ষায় হলো-আমরা যেমন দুনিয়াভোগী হবো না তেমনি দুনিয়াত্যাগীও হবো না।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে উকিল বা অভিভাবক কাকে বানানো উচিত সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا

তিনি তো পূর্ব ও পশ্চিমের (অর্থাৎ সারা জাহানের) মালিক অধিকর্তা। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। কাজে তাঁকেই উকিল বা অভিভাবক বানিয়ে নিন।

এখানে وَكِيْلً (উকিল) বলতে তাকেই বুঝানো হয়েছে, যার উপর নির্ভর করে এবং আস্থা স্থাপন করে নিজের যাবতীয় ব্যাপার সুসম্পন্ন করার দায়িত্বভার অর্পণ করা যায়। আমরা প্রচলিত ভাষায় উকিল তাকেই বলি, যার উপর নিজের মামলা-মুকাদ্দামা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ছেড়ে দিয়ে নিশ্চত থাকি। উকিল সম্পর্কে আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা থাকে যে, সে আমার মামলা ভালভাবে দেখাশুনা করবে, লড়বে ও চালাবে এবং সেই বিষয়ে আমাকে কিছুই করতে হবে না। কাজেই فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের সব কাজ-কারবার ও অবস্থা আল্লাহর কাছে সোপর্দ বা সমার্পণ করা। পরিভাষায় একেই বলে তাওয়াক্কুল। এই দৃষ্টিতে আয়াতটির বক্তব্য হলো, হে নবী এই দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পেশ করার ফলে আপনার বিরুদ্ধে বিরোধিতার যে প্রচন্ড তুফান মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, আর আপনি যে বিপদ-আপদ, অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন, সেই জন্য আপনার দিশেহারা ও বিচলিত হবার কোনই প্রয়োজন নেই এবং কাতর হয়ে পড়াও উচিত হবে না। কেননা, আপনার আল্লাহ তো পূর্ব ও পশ্চিম তথা সমগ্র সৃষ্টির একচ্ছত্র মালিক-অধিপতি। তিনি তো সমস্ত ক্ষমতার মালিক। অতএব আপনি সমস্ত ব্যাপার তারই উপর ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও আশ্বস্ত হয়ে থাকুন। এখন সমস্ত বিষয় ও

www.icsbook.info

ব্যাপার তিনিই দেখাশুনা করবেন। আপনার বিরোধিতাকারীদের সাথে বুঝাপড়া তিনিই করবেন। তিনিই আপনার সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করবেন।

অতপর পরবর্তী আয়াতে বিরুদ্ধবাদীর সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে সেই প্রসঙ্গে নির্দেশনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

وَاصْبِرْ عَلٰى مَايَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا

আর (কাফির) লোকেরা যেসব কথাবার্তা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে তার জন্য আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সৌজন্যতার সাথে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَايَقُوْلُوْنَ -তারা অর্থাৎ কাফিররা যা কিছু বলে বা বলে বেড়ায় তার জন্য আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। অর্থাৎ হে নবী (সঃ) আপনি আপনার নবুয়তি দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে তারা আপনার মিশনকে থামিয়ে দেয়ার জন্য আপনার বিরুদ্ধে যেসব আজেবাজে ও অর্থহীন কথাবার্তা বলে বা মন্তব্য করে এবং কাজকর্ম করে তার প্রতি আপনি দৃষ্টি দিবেন না, তাদের কথায় কান দিবেন না বরং তাদেরকে উপেক্ষা করে চলুন। তারা যেসব অন্যায় আচার-আচরণ করছে, তার কোন জবাব না দিয়ে ধৈর্য ধারণ করুন। এটাই হলো উত্তম পন্থা এবং আপনার জন্য শোভনীয়।

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا -এর শাব্দিক অর্থ, বিষণ্ন ও দুঃখিত মনে কোন কিছুকে ত্যাগ করা। অর্থাৎ মিথ্যারোপকারী কাফিররা আপনাকে যেসব মনোকষ্টকর ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা বলে ও কাজকর্ম করে আপনি সেসবের প্রতিশোধ নিবেন না ঠিক, কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কও রাখবেন না। সাধারণতঃ মানুষের অভ্যাস হলো যার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে, তাকে গালমন্দ দেয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে সম্পর্ক ত্যাগ করার পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়ে هَجْرًا جَمِيْلًا যোগ করে বলা হচ্ছে- সৌজন্যতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। আপনার উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের খাতিরে কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় মন্দ ও কটু কথাও বলবেন না।

নবী (সঃ) এর প্রতি এরূপ নির্দেশের প্রেক্ষিতে একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, তাঁর আচার-আচরণ বুঝি এ হতে ভিন্নতর ও বিপরীত ছিলো, আর এই জন্যই বুঝি আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলে করীম (সঃ) কে এরূপ উপদেশ বা শিক্ষা দিচ্ছেন। না, এটা ঠিক নয়। আসলে নবী করীম (সঃ) পূর্ব

www.icsbook.info

থেকেই এই নীতি ও পন্থা অবলম্বন করে চলছিলেন। কিন্তু আল কুরআনে এরূপ নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্য হলো, কাফিরদেরকে একথা জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেয়া যে, তোমরা যেসব কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছো তার জবাবে রাসূলে করীম (সঃ) যে কিছুই বলছেন না বা করছেন না তা তাঁর কোন দূর্বলতার কারণে নয়। বরং তার মূল কারণ হলো- তোমাদের জবাবে এরূপ সৌজন্যমূলক কর্ম ও আচার-আচারণ গ্রহণ করতে স্বয়ং আল্লাহই তাঁকে নির্দেশ ও শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহর নির্দেশনা মেনেই এসব কিছুকে উপেক্ষা করে সৌজন্যমূলক আচরণ করছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে কাফিরদের সৌজন্যতার সাথে ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে তাদের আচার-আচরণ এবং অসৌজন্যমূলক কর্ম কান্ডের প্রতিদানের বিষয়টি তার হাতে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন–

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا

আর এসব বিত্তশালী বিলাশী মিথ্যাচারী লোকদের বুঝা-পড়ার কাজটি (হে নবী) আমার উপর ছেড়ে দিন। আর কিছু সময়ের জন্য এসব লোকদেরকে এই অবস্থার উপরই থাকতে দিন।

وَالْمُكَذِّبِينَ মিথ্যাচারী কিম্বা মিথ্যাবাদী বলতে কাফির বা খোদাদ্রোহী শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দাওয়াতী মিশনকে বন্দ করার জন্য তারা যেসব কথাবার্তা বা গালমন্দ করতো তা তারা মিথ্যার উপর নির্ভর করেই করতো।

أُولِي النَّعْمَةِ এর نعمة শব্দের অর্থ ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়া অবিশ্বাসী কাফিরদেরই কাজ। এতে প্রমাণিত হয় যে, মক্কায় যেসব লোক রাসূল (সঃ) কে অমান্য-অগ্রাহ্য করতো, কটু কথা বলতো, গালমন্দ করতো এবং মানুষকে রাসূল (সঃ) এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো তারা ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, ভোগ-বিলাসী সচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন লোক ছিলো। রাসূল (সঃ) এর দাওয়াত ও আন্দোলনের বড় আঘাত এসব লোকদের স্বার্থের উপরই পড়ছিলো। শুধু তৎকালীন সময়ই নয় বরং যুগে যুগে সমাজ পরিবর্তন প্রচেষ্টার পথে এই

শ্রেণীর লোকেরাই চিরকাল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, অনইসলামী সমাজ ব্যবস্থা থেকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা হলে সবচেয়ে বেশী যারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটবে তারা হচ্ছে এসব ধনীক শ্রেণীর বিলাসী লোকদের। তাই আল্লাহ পাক রাসূল (সঃ) কে সান্তনা দিয়ে বলেন, তাদের এইসব মনোকষ্টকর আচরণ, গালমন্দ এবং কর্মকান্ডের জবাব দেয়ার দায়িত্বটি হে নবী (সঃ) আমার উপরই ছেড়ে দিন। আর তাদের এই কর্মতৎপরতা চালাবার জন্য আরও কিছু সময় দিন এবং তাদেরকে এ অবস্থায়ই থাকতে দিন। সময় হলে আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সাজা পরিমান মতো দিয়ে দেবো।

তাদের সাজার কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ পরবর্তী আয়াতে বলেন- إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ۝ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

(তাদের জন্য) আমার কাছে আছে শিকল বা বেড়ী, দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন, আর আছে গলায় আটকিয়ে যাওয়া খাদ্য এবং কঠিন পীড়াদায়ক আযাব।

দারসের সর্বশেষ এই আয়াতে মহান আল্লাহ পাক দাওয়াত ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে আহবান) এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলনে যারা বাধাদানকারী হবে তাদের শাস্তির কয়েকটি বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রথম শাস্তি ঃ أَنكَالًا -শিকল বা বেড়ী। অর্থাৎ জাহান্নামে দুনিয়ার এসব পাপী-অপরাধী লোকদের পায়ে বড় এবং ভারী লোহার শিকল বা বেড়ী পরিয়ে দেয়া হবে। জাহান্নাম থেকে পালিয়ে যাবার আশংকায় তাদের পায়ে বেড়ী পরানো হবে না। কেননা, কারো শক্তি বা ক্ষমতা নেই যে জাহান্নাম থেকে পালাতে পারে। বরং বেড়ী পরানোর উদ্দেশ্য হলো শাস্তি দেয়া। এটা হলো শাস্তি বা সাজার বেড়ী। এই বেড়ীর ভারে তারা উঠতে এবং চলতে ফিরতে পারবে না। এটা হলো শাস্তির উপর শাস্তি।

দ্বিতীয় শাস্তি ঃ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ -গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ যে খাদ্য গলায় এমনভাবে আটকিয়ে যাবে যে, গিলাও যাবে না আবার উগলিয়ে ফেলাও যাবে না। এ ধরণের খাদ্যের কথা হাদীসে যরী ও যাক্কুমের বর্ণনা করা হয়েছে।

www.icsbook.info

তৃতীয় শাস্তি ঃ وَّجَحِيمًا -কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি। 'জাহীম' জাহান্নামের সাতটি স্তর বা নামের মধ্যে একটি স্তর। তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে বটে তবে সেই শাস্তি হবে কঠিন যন্ত্রণা ও পীড়াদানকারী শাস্তি যা কুরআন এবং হাদীসে তার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ আমাদেরকে এসব কঠিন শাস্তি থেকে হেফাজত করুন এবং দুনিয়াতে এসব কঠিন পীড়াদানকারী শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য দাওয়াত ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে দাওয়াত) এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর পথে জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলন) করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শিক্ষাঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা মুজ্জাম্মিল এর ১ থেকে ১৩ নং আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা হলোঃ

○ সূরা মুজ্জাম্মিল এর নির্দেশ বা শিক্ষাগুলো যদিও নবী করীম (সঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু এর শিক্ষা গোটা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য। কেননা, কুরআনের শিক্ষা কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক এবং সাময়িক নয় বরং সামগ্রীক এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকরী থাকবে। আমরা যখন কুরআন অধ্যয়ন করবো তখন মনে করতে হবে যে, কুরআনের নির্দেশ যেন এখনই আমার জন্যই নাযিল হলো

○ আল্লাহর নবীর মাধ্যমে আমাদের উপর দাওয়াতে দ্বীনের এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর যে দ্বায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা আলোস্য ভাবে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে চাঁদর মুড়ী দিয়ে বিমুখ না থেকে বরং মহান দায়িত্ব পালনে উঠে পড়ে লেগে যাওয়া। রাতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে অর্থাৎ কিছু সময় ঘুমিয়েই ঘুম থেকে উঠে পড়া এবং তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়িয়ে যাওয়া ও নিয়মিত এই নামায আদায় করা। উল্লেখ্য যে, যদিও এই নামায আমাদের উপর নফল তবুও তা নিয়মিতভাবে আদায় করা।

○ তাহাজ্জুদ নামাযে কতটুকু রাত অতিবাহিত করতে হবে তার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর তা হলো- অর্ধ রাতকে ভিত্তি করে তার চেয়ে বেশীও হতে পারে আবার কমও হতে পারে। এটা ব্যক্তির ইখতার বা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এখানে কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। শরীর-স্বাস্থ্য এবং ধৈর্যের উপর নির্ভর করে।

www.icsbook.info

o কুরআন পাঠ করতে হবে থেমে-থেমে স্পষ্টভাবে বুঝে-সুঝে এবং সুন্দর-সাবলীল আওয়াজে। এখানে কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত বা নামাযের কিরাত পড়তে হবে তার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর এই নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযের কিরাত তা জিহরী (প্রকাশ্য) হোক বা (শিররী) অপ্রকাশ্য কিরাত হোক সকল কিরাতই বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে, টান দিয়ে, আয়াতে আয়াতে থেমে থেমে, অনুধাবন করে সুন্দর ও সাবলীলভাবে পাঠ করা, অশুদ্ধ, অস্পষ্ট এবং দ্রুততার সাথে না বুঝে কবিতার মতো পাঠ না করা। যা আমরা অধিকাংশ লোকই করে থাকি। বিশেষ করে রমযান মাসের কুরআন খতমের নামে একটি নফল আ'মল করতে যেয়ে অধিকাংশ হাফিজে কুরআন ফরজ তরক করে থাকেন। আল্লাহ আমাদেরকে এ অবুঝ আ'মল থেকে বাঁচিয়ে বুঝ দান করে সহীহ আ'মল করার তাওফীক দান করুন।

o আমাদের উপর অর্পিত মহান দ্বায়িত্ব আল কুরআনের বিধি-বিধানের গুরুভার বহন করার জন্য তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা। কেননা, মহান এ দ্বায়িত্ব এবং গুরুভার বহন করার জন্য তাহাজ্জুদ নামায অত্যন্ত সহায়ক।

o ইবাদতের জন্য রাতের বেলা উঠা কুপ্রবৃত্তি দমনে বেশ সহায়ক। রাতের নামাযের কয়েকটি তাৎপর্য উল্লেখ করা হলো–

১. মানুষের প্রকৃতিই হলো রাতের বেলা ঘুমানো এবং বিশ্রাম গ্রহণ করা। এই স্বভাবসুলভ প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিশ্রাম ত্যাগ করে ইবাদতে দীর্ঘক্ষণ নিয়োজিত থাকা কৃচ্ছসাধনার কাজ। এই কৃচ্ছসাধনা প্রবৃত্তি দমন ও নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য বেশ সহায়ক। আর যে লোক এভাবে নিজের নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পারবে এবং নিজের দেহ ও মনের উপর প্রভাব ফেলতে পারবে এবং নিজের সমস্ত শক্তিকে আল্লাহর পথে ব্যয় ও ব্যবহার করতে পারবে, সেই সবচেয়ে বেশী দৃঢ়তার সাথে সত্য ও শাশ্বত দ্বীনের দাওয়াতকে দুনিয়ার বুকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

২. মানুষের মন-দেল ও মুখের ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে পারবে। কেননা, রাতের বেলায় নিরিবিলি এই নামাযে বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যে তাসাউফ বা গভীর প্রেম সৃষ্টি করতে খুব বেশী সহায়ক হয়।

www.icsbook.info

৩. রাতের বেলায় এই ইবাদত বান্দার ভিতর ও বাইরের মধ্যে সঙ্গতি সৃষ্টি করে। কেননা, রাতের বেলায় সবার অজান্তে যে ব্যক্তি আরাম-বিরামকে উপেক্ষা করে ইবাদাত করার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে, সে অবশ্যই এটা একান্ত নিষ্ঠার কারণে এবং আন্তরিকতার সাথেই করে থাকে। তার মধ্যে রিয়া বা লোক দেখানোর কোন সুযোগই থাকে না।

৪. যেহেতু এই ইবাদত দিনের বেলার তুলনায় বেশ কষ্টকর। তাই এই নামায নিয়মিত আদায় করার ফলে ব্যক্তির মধ্যে অবিচলতা, স্থিতিশীলতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণ সৃষ্টি হয়। ফলে আল্লাহর পথে যে কোন কাজ খুব দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে করা যায় এবং কঠিন বিষয় গুলো সহজভাবে সমাধান করা যায়।

০ রাতের বেলায় কুরআন তিলাওয়াত করা। কারণ, রাতে কুরআনকে খুব বেশী প্রশান্তি, নিশ্চিন্ততা ও মনোযোগের সাথে পড়া যায়। কেননা, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি, কোলাহল, চেঁচামেচি ও হট্টগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিষ্ক ব্যাকুল হয়ে উঠে না। রাতে কুরআন খুব বেশী চিন্তা, গবেষণা ও মনোযোগের সাথে পড়া যায়।

০ দিনের বেলায় মানুষকে নিজের ও পরিবারের ব্যস্ততা এবং সমাজের দায়িত্ব পালনে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়, সুতরাং রাতকেই আল্লাহর ইবাদতের জন্য বাছাই করে নেয়া উচিত। কেননা, দিনের সমস্ত কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে নিরিবিলি একাগ্রচিত্তে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাতে প্রয়োজন অনুযায়ী ঘুম ও বিশ্রাম এবং তাহাজ্জুদের নামায মনোনিবেশের সাথে ব্যস্ততা ছাড়াই আদায় করা যায়।

০ সদাসর্বদা আল্লাহর যিকির বা স্মরণে মশগুল থাকা। এখানে যিকির মানে সমাজে প্রচলিত একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক বিশেষ কায়দায় الله الله বলা নয়। বরং উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, কাজে-কর্মে, মুখে-অন্তরে সর্বদা ও সকল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ রাখা। অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলা।

০ দুনিয়ার সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়ে যাওয়া। এর মানে এই নয় যে, দুনিয়ার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে رَهْبَانِيَّةً বা বৈরাগ্যবাদী হয়ে যাওয়া। কেননা, বৈরাগ্যবাদকে ইসলাম

সমর্থন করে না। এর অর্থ হলো, সমস্ত সৃষ্টির সাহায্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করা। ইবাদতের মধ্যে কোন শিরক না করা, নিজের সমস্ত কাজ-কর্ম, উঠা-বসা, চলাফেরায় আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং আল্লাহর উপরই ভরসা রাখা। অন্যকে লাভ-লোকসান ও বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করা। আর এসব কিছুই বিবাহ-সাদী, আত্মীয়তা, যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কর্ম এবং সামাজিক কাজ কর্মের সাথে জড়িত থেকেই করা সম্ভব। আল্লাহ এবং দুনিয়ার সাথে সমন্বয় করেই দুনিয়াতে চলতে হবে। দুনিয়াভোগীও যেমন হওয়া যাবে না, তেমনি দুনিয়া ত্যাগীও হওয়া যাবে না।

o পূর্ব ও পশ্চিম অর্থাৎ সারা জাহানের মালিককেই একমাত্র উকিল বানানো। নিজের দেখভাল করার দ্বায়িত্ব আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া। তাঁর উপরই নির্ভর করা। দাওয়াতী দ্বীনের দ্বায়িত্ব পালন করতে যেয়ে প্রচন্ড বিরোধিতা এবং বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হলে দিশেহারা ও বিচলিত না হয়ে পড়া বরং তা মোকাবেলা করার দ্বায়িত্ব আল্লাহর উপর সোপর্দ করে দিয়ে অর্পিত দ্বায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখা।

o আল্লাহর দ্বীনের কাজ করতে যেয়ে খোদাদ্রোহী, মুশরিক ও মুনাফিক শক্তির বিভিন্ন মন্তব্য, কটুক্তি ও গালমন্দের প্রতি দৃষ্টি এবং কান না দিয়ে উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আর তারা যেসব অন্যায় আচার-আচরণ করে তার কোন জবাব না দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে ধৈর্য ধারণ করা এবং প্রতিবাদ স্বরূপ তাদেরকে গালমন্দ না করা। তাদের মনোকষ্টকর ও পীড়াদায়ক কথা ও কাজকর্মের প্রতিশোধ না নিয়ে বরং তাদেরকে এড়িয়ে চলা।

o দ্বীনি আন্দোলনের বিরোধিতাকারী, মিথ্যাচারী, ভোগবাদী এবং অর্থ সম্পদের অহংকারী শক্তির বুঝাপড়ার বিষয়টি নিজে না নিয়ে আল্লাহর উপরই ছেড়ে দেয়া। কেননা, যারা দ্বীনি আন্দোলনের বিরোধিতা করে তারা মিথ্যার উপরই নির্ভর করেই করে থাকে। তারা সত্যকে গোপন করে। অর্থ-সম্পদ, ভোগ-বিলাস এবং জনবল মানুষকে খোদাদ্রোহিতায় উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য যুগে যুগে দেখা যায় এসব লোকরাই আল্লাহর দ্বীনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আল্লাহর দ্বীনের বিরোধীদের মোকাবেলা যুগে যুগে আল্লাহ নিজেই করে এসেছেন। সুতরাং এখনও তিনি

www.icsbook.info

এর মোকাবেলা করবেন এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবেন। তাই যারা আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করে তাদের এই কাজটি করার সুযোগ দিয়ে দেয়। আল্লাহ্ সুযোগ এবং সময় মতো তার জবাব দিয়ে দেবেন।

এবং পরকালে তাদেরকে কঠিন সাজা দান করবেন। সাজা বা শাস্তিগুলো হলো-

১. তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হিসেবে লোহার ভারী এবং বড় শিকল বা বেড়ী পরিয়ে দেবেন। যাতে তারা উঠতে বসতে না পারে। এটা হলো শাস্তির উপর শাস্তি।

২. তাদেরকে দেয়া হবে গলগ্রহ খাদ্য। যে খাদ্য এমন ভাবে আটকিয়ে যাবে যে, গিলতেও পারবে না আবার উগলিয়ে ফেলতেও পারবে না। যেমন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যরী ও যাক্কুম নামীয় খাদ্য।

৩. কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দেয়া হবে। জাহান্নামে তো তাদের শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু সেই শাস্তি হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ আমাদের এসব শাস্তি থেকে হিফাজত করুন। আমীন।

আহ্বান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে প্রিয় ভাইয়েরা ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা মুজ্জাম্মিল এর প্রথম দিকের আয়াতগুলোর যে ব্যাখ্যা ও শিক্ষা পেশ করা হলো তা যদি আমার অজান্তে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর দারস থেকে যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমরা আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। অয়াআখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।

——— ০ ———

www.icsbook.info

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

দারসে হাদীস ১ম খন্ড

দারসে হাদীস ২য় খন্ড

দারসে কুরআন ১ম খন্ড

দারসে কুরআন ২য় খন্ড

দারসে কুরআন ৩য় খন্ড

দারসে কুরআন ৪র্থ খন্ড

ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ

বিষয় ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস

আল-কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব

রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রূহানী নামায

বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন

বাংলা উচ্চারণ সহ ১০০ মাসনুন দোয়া

কুরআন হাদীসের আলোকে পাঁচ দফা কর্ম সূচী

ফাযায়িলে ইকামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার) মর্যাদা

www.icsbook.info

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। - আল হাদীস

লেখকের অন্যান্য বই

দারসে হাদীস-১ম খন্ড
দারসে হাদীস-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-১ম খন্ড
দারসে কুরআন-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-৩য় খন্ড
দারসে কুরআন-৪র্থ খন্ড
ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস
আল কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রুহানী নামায
বিষয়ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
কুরআন হাদীসের আলোকে ৫দফা কর্মসূচী
ফাযায়েলে ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার) মর্যাদা

সাহাল প্রকাশনী

সাহাল প্রকাশনী